চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর

কয়েকটি প্রকাশনার প্রচ্ছদচিত্র

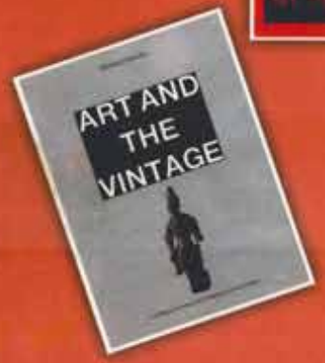

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিবাদের ভাষা একুশের সংকলন থেকে কিছু লেখা

প্রতিবাদের ভাষা

একুশের সংকলন থেকে
কিছু লেখা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর

প্রতিবাদের ভাষা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর

প্রতিরূপ সংস্করণ প্রসঙ্গে

এই সংগ্রহের অধিকাংশ রচনা অগ্রন্থিত। ইফতেখার চৌধুরী, শিরিণ আখতার ও গোলাম কিবরিয়া ভূইয়ার লেখা এই সংকলনের জন্যে রচিত। অন্যান্য রচনা ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৩র মধ্যে চাকসু ও অন্যান্য গোষ্ঠীর প্রকাশিত কয়েকটি একুশের সংকলন থেকে সংগ্রথিত। আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও একুশের সংকলনের সব সম্পাদকের ফটো সংগ্রহ করতে পারি নি। স্থানাভাবে অনেক লেখাই অসংকলিত রয়ে গেল। এই প্রতিরূপ সংস্করণ প্রকাশে সহযোগিতা পেয়েছি অধ্যাপক আবুল মনসুর, জয়দুল হোসেন, মুহাম্মদ শামসুল হক, মহিউদ্দীন শাহ আলম নিপু, মইনুল আনাম ও রঞ্জন বড়ুয়া'র।

—সম্পাদক

প্রচ্ছদ : জিয়াউদ্দিন চৌধুরী

প্রকাশনা সহযোগিতায় :
জিয়াউদ্দিন চৌধুরী, মোহাম্মদ লোকমান, আবদুস শাকুর
আয়শা আখতার, মুখছুদুর রহমান ও জাহাঙ্গীর আলম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত
পূর্বা, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

মূল্য : ১০০ টাকা

প্রতিবাদের ভাষা

একুশের সংকলন থেকে
কিছু লেখা

সম্পাদনা
ভূঁইয়া ইকবাল

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

উৎসর্গ
একুশের প্রথম সংকলনের
সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান
ও
প্রকাশক মোহাম্মদ সুলতান
স্মরণে

লিনোকাট (১৯৫৩) শিল্পী : মুর্তজা বশীর

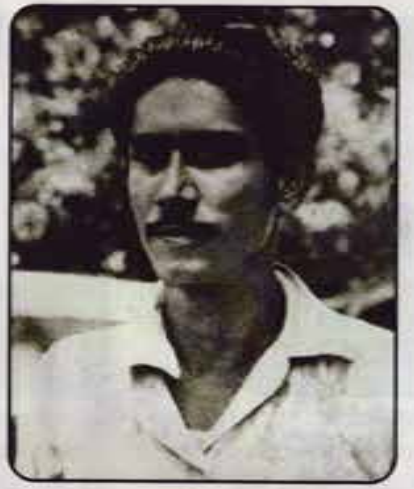

শেখ মুজিবর রহমান
১৯৪৮-এ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের
নেতৃত্বদানকারী

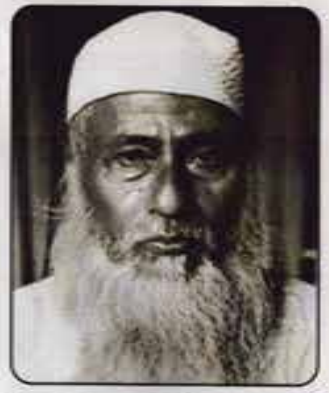

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
শহীদ মিনারের উদ্বোধক (১৯৫২)

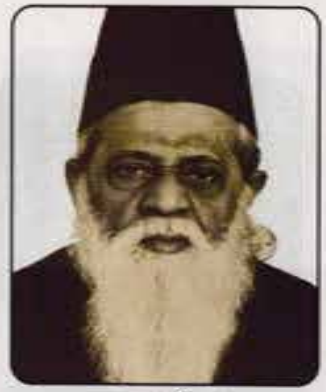

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবির
প্রথম উত্থাপক

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
পাকিস্তানের গণপরিষদের প্রথম
অধিবেশনে বাংলাকে গণপরিষদের
ভাষা হিসেবে অর্ন্তভুক্তির দাবি উত্থাপক

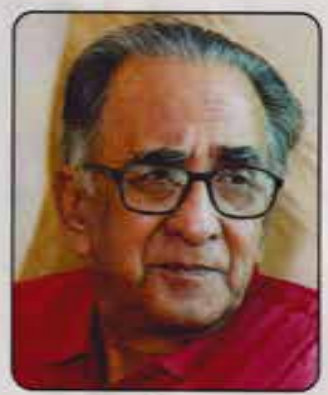

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি
১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী আন্দোলনকারীদের
অগ্রণী ছাত্র নেতা

বদরউদ্দিন উমর
ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকার

আবদুল গাফফার চৌধুরী
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানোর
গীতিকার

মাহবুবুল আলম চৌধুরী
একুশের প্রথম কবিতার লেখক

আনিসুজ্জামান
ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে
প্রথম পুস্তিকার লেখক (১৯৫২)

আলতাফ মাহমুদ
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানোর
সুরকার

শিল্পী মুর্তজা বশীর
প্রথম লিনোকাট শিল্পী

একুশের সংকলনের কয়েকজন সম্পাদক

হাসান হাফিজুর রহমান

দিলওয়ার

খান মোহাম্মদ ফারাবী

কায়সুল হক

চৌধুরী জহরুল হক

ভূঁইয়া ইকবাল

ময়ূখ চৌধুরী

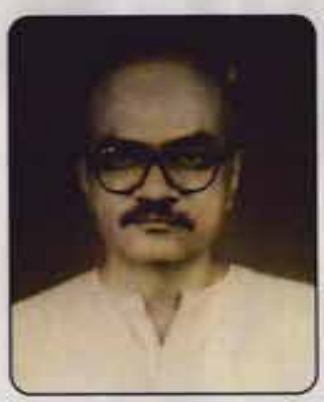

আবুল মোমেন

মহিউদ্দিন শাহ আলম নিপু

শামসুল হোসাইন

অনীশ বড়ুয়া

শওকত হাফিজ খান রুশ্দি

নিতাই সেন

সিরাজউদ্দিন আহমেদ

মাহমুদুল আলম

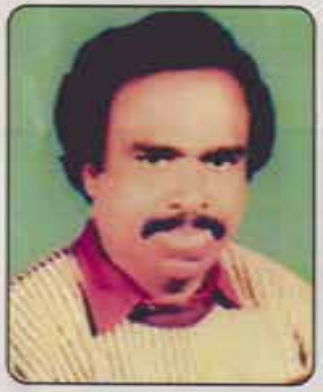

মোঃ মোজাম্মেল হক

মুহাম্মদ আইউব

কয়েকটি একুশের সংকলনের প্রচ্ছদচিত্র

বায়ান্নের বিনিদ্র প্রহর
শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী

জয় ধ্বনি'৭০
শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী

রক্ত গোলাপ
শিল্পী আবদুর রউফ খোকন

ক্রান্তি
শিল্পী সবিহ-উল আলম

দীপ্ত একুশে
শিল্পী আবদুর রাজ্জাক

রক্ত সূর্য
শিল্পী আবদুর রাজ্জাক

বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাটি
শিল্পী রনজিত নিয়োগী

সূর্য তোরণ
শিল্পী সবিহস-উল আলম

একুশ মানে মাথানত না করা
শিল্পী আবুল মনসুর

তোমরা যারা নিবেদিত
শিল্পী সবিহ-উল আলম

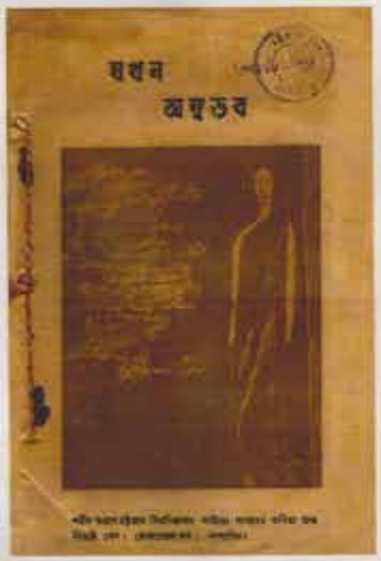

যখন অনুভব
রবীন্দ্রনাথের ছবি অবলম্বনে

চৌধুরী জহুরুল হক - সম্পাদিত
শহীদ স্মরণে বাংলা ভাষা ও
সাহিত্য দিবস উদযাপন,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (১৩৭৬)

কলতান
শিল্পী আবুল মনসুর

একুশের প্রথম সংকলন (১৯৫৩)
শিল্পী আমিনুল ইসলাম

বালাক
শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী

সংশপ্তক
শিল্পী রশিদ চৌধুরী

এতো বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ
শিল্পী কালাম মাহমুদ

দুঃখিনী বর্ণমালা
শিল্পী কালাম মাহমুদ

স্পন্দন
শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী

আরেক ফাল্গুন
জহির রায়হানের
ভাষা আন্দোলন নিয়ে উপন্যাস

মুনীর চৌধুরীর কবর

পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি
বদরুদ্দীন উমর

কবিতা

সৈয়দ আলী আহসান ▫ ১৯
শামসুর রাহমান ▫ ২০
আবু হেনা মোস্তফা কামাল ▫ ২১
এখলাস উদ্দিন আহমদ ▫ ২২
শহীদ কাদরী ▫ ২৩
মোহাম্মদ রফিক ▫ ২৪
হুমায়ুন কবির ▫ ২৫
বুলবুল খান মাহবুব ▫ ২৬
আবুল হাসান ▫ ২৭
সাযযাদ কাদির ▫ ২৮
কাজী রোজী ▫ ২৯
হেলাল হাফিজ ▫ ৩০
ময়ূখ চৌধুরী ▫ ৩১
ইফতেখার চৌধুরী ▫ ৩২

সৈয়দ আলী আহ্‌সান

তাদের জয় হোক

আমাদের আকাশ একটি বিক্ষুব্ধ কল্লোলের চন্দ্রাতপ
আমরা যে এসেছি পৃথিবীতে
সে কার আকাঙ্ক্ষায় জানিনা
অসমাপ্তি প্রবোধবাক্য
খসে-পড়া নক্ষত্রের মধ্যে হারিয়ে যায়—

এর মধ্যে যারা সমুদ্র থেকে শঙ্খের প্রবাল নিয়ে এলো
যারা অলৌকিক রক্তে প্রদোষকে চিহ্নিত করলো
যারা অজস্র বর্শার চেয়েও তীক্ষ্ণধার
উচ্চারণ নিক্ষেপ করলো

তারাই একমাত্র মৃত্যুতে গত হয়ে
বেঁচে উঠলো শোভার সৌন্দর্যে
আমাদের প্রতিদিনের মৃত্যুতে
তারাই শুধু বেঁচে রইলো মাধবীলতার মতো—

তাদের জয় হোক।

শামসুর রাহমান

আমি কথা বলাতে চাই

আমি কথা বলাত চাই,
কথা বলাতে চাই আমার ঘরের আসবাব পত্রকে,
ছাদের কানিশ আর জানালাকে, নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে যে-গাছ,
গাছের ডালে লাফাচ্ছে যে-কাঠবিড়ালী,
আর আস্তাবলে ঝিমোচ্ছে বুড়োটে যে ঘোড়া,
তাদের আমি কথা বলাতে চাই।
গাছের যত পাতা, আকাশের যত নক্ষত্র,
নদীর ঢেউ, হাওয়ার প্রতিটি ঝলক,
প্রতিটি ফুল, শিশিরের প্রতিটি বিন্দু,
আমার চোখের মণি, আমার হাত-পাছ,
ওদের সবাইকে আমি কথা বলাতে চাই।
কী ওরা বলবে, এক্ষুনি বলা মুশকিল।
সবাই কি বলবে একই কথা
ঘুরে ফিরে? নাকি প্রত্যেকেই বলবে নিজস্ব কথা
অনন্ত উচ্চারণে!
ওরা কি শোনাবে কোনো তত্ত্বকথা?
বলবে কি হাইড্রোজেন বোমার অন্তঃকাহীনি?
বলবে কি হিরোশিমা ভয়াবহভাবে
পঙ্গু হওয়ার পর
কী করে আধুনিক চৈতন্যে জমলো দুঃস্বপ্নের ভিড়?
ওরা কি দেবে স্বৈরতন্ত্রী মিথ্যার একনিষ্ঠ বিবরণ?
ওরা বলুক যে যার কথা, যেমন ইচ্ছা বলুক।
সত্যাগ্রহের আগেই
ওদের সবাইকে আমি বাক্ স্বাধীনতা দিতে চাই।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

প্রত্যাবর্তন

যখন বাংলাদেশের শহরে গ্রামে গঞ্জে
অতর্কিতে আসে ফাল্গুণ,
মনে হয় রক্তিম ফুলের পতাকা উড়িয়ে
তোমরা আবার ফিরে এলে।

পরিপূর্ণ শস্যের বাগানে যেন বর্ণমালার সভা,
সন্ধ্যার ঘন আকাশে
নক্ষত্রের মতো ফুটে ওঠে তোমাদের মুখ
রক্তের ভেতরে যে নদীর তরঙ্গ সারাদিন বাজে
সেখানে তোমরা ফিরে আসো পবিত্র অনুভবের মতো।

এখলাসউদ্দিন আহমদ

হালের ছড়া

কই গেল তোর কথার ফানুস
লোক দেখানো লালটু লাটিম
কই গেল তোর ভয় দেখানো
শিং উচা সব হাট্টিমাটিম
কই গেল তোর চোখ রাঙানি
কই গেল তোর বেতার ভাষণ
কই গেল তোর শান্তী সেপাই
কই খোয়ালি সাধের আসন
রাত নিষুতে কই পালালি
কই গেল তোর দালান কোঠা

দাদার এখন সব খুইয়ে
বেবাক পুঁজি গামছা লোটা॥

শহীদ কাদরী

চীৎকার আমাদের চকচকে টাকা

একটি মোহন অস্ত্রের মতো সুন্দর সোনালি চীৎকার
আমাদের একান্ত নির্ভর,
একটি চীৎকারে গেঁথে রেখেছি আমাদের প্রেম এবং প্রয়োজনগুলো !
যখন গান কিংবা গোলাপ
কিংবা উদ্যান
অর্থাৎ সুধীন দত্তের 'ন্যায়, মিতালি ও ক্ষমা' বাযুত্যাগের শব্দের মতো
অথবা কোন অনুর্বর মহিলার অশ্লীলপনার মতো
স্বস্তি, শান্তি অথবা উত্তেজনাও যোগায় না
তখন চীৎকার একটা অলৌকিক বন্দুকের মতো গর্জে ওঠে,
সোনালি কার্তুজের মতো আমাদের অনুপম বক্তব্য
সম্রাটকে বিদ্ধ করে
আমাদের আটপৌরে অস্তিত্বের গান গায়।
চীৎকার আমাদের চকচকে টাকা
যা দিয়ে কিনে নেবো শীতবস্ত্র
ভ'রে তুলবো ভাড়ার ঘরের হা-খোলা বৈয়ম,
সবকিছু আজ চীৎকার করে চাইতে হয়—স্বাস্থ্য, স্বস্তি এবং আয়ু,
চীৎকার করে, 'ভালোবাসা, ভালোবাসা'।
এই সম্মিলিত চীৎকারে গোপন প্রেমপত্রের মতো আমিও
পৌঁছে দিতে চাই আমার ব্যক্তিগত হিরণ্ময় চীৎকার।

মোহাম্মদ রফিক

ঈপ্সিত

বিশেষ একটি জন্ম মৃত্যুর সে নয়
বরং অনেক জন্ম মৃত্যুর গভীরে
উচ্চারিত, তাই বুঝি আন্দোলিত হয়
এই বোধ বিস্ময়ের তটলগ্ন ছুঁয়ে ;

প্রত্যয় নিচয় সব ম্লান হয়ে যায়
হৃদয় অথবা এই জন্মের আঁধারে
তবু বেঁচে থাকে কিছু, যেমন উদ্গত
নাস্তিতে গানের স্তব অতল বিষাদে।

বিস্ফোরণের পথে

হুমায়ুন কবির

তুমি শুধু দেখে যাও কি রকম বেঁচে আছি
পাউরুটির মত বাসি আমাদের দিন
মৃত্যুর শব্দ ছাড়া কোন ধাতব শৃঙ্খলা আজ নেই
বাইরে তুমুল মেঘ সূর্য ঢেকে রাখে
ধূসময় তোমার স্মৃতি ও ছায়া
ছিন্ন ভিন্ন প্রাচীন সুরভি।
আজন্ম স্মৃতির ভারে জরতপ্ত
মরণের শব্দ বেজে ওঠে। চলে গেছ
তবু এক ভূত আমাদের ব্যবহার নিয়ে চলে ফেরে
এখন তোমাকে ছাড়া বেঁচে আছি
বিস্ফোরণের পথে চলে এসে
কি রকম দুঃখে আছি যদি দেখে যেতে।

আজকের কবিতা। বুলবুল খান মাহবুব

দিগন্তে বাজে উদ্দাম রণভেরী
অশান্ত মন দুর্জয় ধ্বনি তোল
এসেছে সময় আর নয় ওরে দেরী
লক্ষ যুগের তন্দ্রার গ্লানি ভোল।

আজকে রক্তে চঞ্চল বিদ্রোহ
স্বচ্ছ দিনের পেয়েছি অঙ্গীকার
কুসুমপেলব ললিতকলার গা
অশ্রুধারায় শোধ দেবো না তো আর।

আজ মুক্তির হিংস্র নগ্ন দিন
আজ যৌবন ঘরে ঘরে আদৃত
আজ মানুষের স্বপ্নেরা নয় ম্লান
মিছিলে মিছিলে জীবন উদ্ভাসিত।

কল্পনা পায় সূর্যের উষ্ণতা
প্রেমে আজ তাই জীবনের মত্ততা
আজ জীবনের, আজ সূর্যের আলোকিত উৎসব
আজ জনতার বক্ষে বক্ষে স্পন্দিত বিপ্লব।

আবুল হাসান

শিল্পানুরোধ

হাড়ের কঙ্কের মতো সারি সারি দাঁড়িয়েছে এখানে জনতা,
আমিও তাদের একজন
আমার শরীরে আছে সহজাত দারুণও রক্তের কাগজ,
চিত্রবাহিতায় যদি পারো শিল্পী আঁকো তাতে
নিরন্ন মানুষ আর অন্নাভাবে
শহরের ফুটপাতে হাঁটা সব ব্যবসায়ী বালিকার বিষন্ন শয়ন,
টাইপিষ্ট মহিলার মক্ষিকার মতো গুঞ্জরিত পাঁচটি ক্ষীণ
ক্ষুধার্ত আঙুল আঁকো
আঁকো মানুষের সহজাত অবিশ্বাস, অপ্রেম, অন্যায় ;
আঁকো দাঙ্গা, যুদ্ধের যৌবন, টনেডো, দেশজ কৃষ্টির কানে
বিদেশী গয়নার কারসাজি !
যা কিনা বিছানা থেকে তুলে নেয় জীবনের সকল সম্পদ,
বিবাহিতা সমস্যার স্বামী ও সন্তান,
আঁকো হত্যাদৃশ্য, ভাইয়ে ভাইয়ে হিংসাযজ্ঞ ; হীন অভিপ্রায়,
লক্ষ্য মানুষের একত্রে কবরদৃশ্য,
নরক নির্মিত এই অলজ্জ শহর, যে কিনা বিবস্ত্রা হয়ে
সারারাত রয়েছে দাঁড়ায়ে,
যার শরীরের নগ্নতাকে ঢেকে দিতে সুহৃদ সময়
আজ কাপড়ের পরিবর্তে
পরিয়েছে প্রবল পোষ্টার !

সাধবাদ কাদির

রাষ্ট্রভাষা

যোগাযোগ থেকে বেরিয়ে এলো
আক্রমণ, সভা-শোভা-
যাত্রা-মিছিল ;
ছিলো শ্লথগ সৌন্দর্যের ভেতর
স্বপ্নারূঢ়,
ছিলো শাদা পায়রাগুলির মিলিত
রাত্রিচারিতায়,
আমাদের সম্পন্ন
কৃষিকাজে।

দীর্ঘতম আঙুলে যোগাযোগ দাও
মৃত্যুর গর্জন,
উচ্চতম কণ্ঠস্বরে আক্রমণ দাও
বিদ্বেষবিষে।

জননী সম্রাজ্ঞী।
দুরূহ প্রয়াস আনো ঢোলকে, ভাই,
এবার মাটির কাছাকাছি আনো
সব পদাতিক ঃ
সূর্যোদয় ॥

কাজী রোজী

গাঁয়ের মেয়ে যতো

আমরা কটি গাঁয়ের মেয়ে নামবো নাকি ঘাটে
নদীর জল তরল জানি স্বচ্ছ নিরাকার
সবুজ ঘাসে দূর্বাদলে দুধার ঢাকা আছে
অনেক চেনা চিলতে কোঠা ওইতো দূরের বাটে।
গাঁয়ের পাশে শকুন্তলা নামের পাখী ডাকে
নিমের ডালে তিক্ত রসে গভীর রাত চিরে
শিকার খুঁজে ফিরছে শুধু গায়ের মেয়ে যত
ধূম্র বনে হিজল ছায়ে ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে।
বনলতার ঝোপের কাছে চোখটি আছে পাতা
চিনবো বলে গাঁয়ের মেয়ে বধূ কিম্বা চুড়ি
নয়তো কারো সিঁদুর আটা রক্ত তিলক দেখে
আলতো ছোব এই দেশেরই কালো কেশের মাথা।
চক্রধারী রাস্তাটা ওই ভাগ্য দিয়ে গড়া
সোনা বরণ ধানের নামে খাবার গুলো পুরে
কিংবদন্তী আমরা নাকি বড্ড ভালবাসি
পানির ভার বহন করা মৃদু মাটির ঘড়া।
ছোট ছেলে এই দেশেরই শীতল মা'র বুকে
আকাশ জোড়া ছাদের নীচে নরম বিছানাতে
আদর করা গালিচা তার সবুজ ঘাসে পাতা
শান্ত মনে আমরা জানি দুচোখ বোজে সুখে।
আমরা তবু আলপথেরই নিশান নিয়ে হাতে
উড়িয়ে ধুলো নদীর ঘাটে দেশের মাঠে মাঠে
এই দেশেরই নাম দিয়ে যাই-শ্যামলা রূপা মেয়ে
নিখুত মনে স্বদেশ ভূমি আঁকছি দিনে রাতে।
আমার দেশে শ্যামল মেয়ে আমার নামে তাই
নিবিড় করে বুকের মাঝে ঠাঁইটি দিয়ে যাই।

হেলাল হাফিজ

অন্যরকম সংসারেতে

এইতো আবার যুদ্ধে যাবার সময় হলো
আবার আমার যুদ্ধে খেলার সময় হলো
এবার রানা তোমায় নিয়ে আবার আমি যুদ্ধে যাবো
এবার যুদ্ধে জয়ী হলে গোলাপ বাগান তৈরী হবে।

হয়তো দু'জন হারিয়ে যাবো ফুরিয়ে যাবো
তবু আমি যুদ্ধে যাবো তবু তোমায় যুদ্ধে নেবো
অন্য রকম সংসারেতে গোলাপ বাগান তৈরী করে
হারিয়ে যাব আমরা দু'জন ফুরিয়ে যাবো।

স্বদেশ জুড়ে গোলাপ বাগান তৈরী করে
লাল গোলাপে রক্ত রেখে গোলাপ কাঁটায় আগুন রেখে
আমরা দু'জন হয়তো রানা মিশে যাব মাটির সাথে।

মাটির সাথে মিশে গেলে জৈবসারে গাছ বাড়াবো
ফুল ধরাবো, গোলাপ গোলাপ স্বদেশ হবে
তোমার আমার জৈবসারে। তুমি আমি থাকবো তখন
অনেক দূরে অন্ধকারে অন্যরকম সংসারেতে।

একুশের ছড়া

মমুখ চৌধুরী

লিখতে গেলে ছড়া
মিষ্টি বুলি তাই হয়ে যায় কড়া।

লিখতে গেলে ছড়া
কলম দিয়ে বেরিয়ে আসে বারুদ-ঠাসা বড়া।

লিখতে গেলে ছড়া
লাল চিতাতে পুড়তে যেহয় শ্রেনীশত্রুর মড়া।

ইফতেখার চৌধুরী

এখনো দুঃসময়

বৈকালির কাটেনি বিকেল,
এখনো বিষাদ মেঘ
রোদ্দুরের জোয়ার-ভাটায়
ঢাকে করুণ আবেগ।

চেতনার সবুজ পতাকা
কোথায় নিয়েছে ঠাঁই !
দুঃসময়ের সাথীরা তার
লজ্জায় মুখ লুকায়।

বৈকালির উদাসী হৃদয়ে
অজানা কষ্টের নুড়ি
গড়ছে বেদনার মিনার
উড়িয়ে স্বপ্নের ঘুড়ি।

একুশ যায় একুশ আসে
বাড়ে ক্ষোভের সীমানা
নিরন্তর মাঠে-ঘাটে ভরা
পাপীদের আনাগোনা।

একুশের সন্ধানে বৈকালি
গুণছে একা প্রহর,
প্রভাত ফেরীর স্নিগ্ধ গান
কবে নেবে অবসর।

প্রবন্ধ

মাহবুব-উল আলম ❑ ৩৫
মুহম্মদ এনামুল হক ❑ ৩৭
আবুল ফজল ❑ ৩৮
রণেশ দাশগুপ্ত ❑ ৩৯
শওকত ওসমান ❑ ৪১
আহমদ শরীফ ❑ ৪২
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ❑ ৪৩
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ❑ ৪৮
আনিসুজ্জামান ❑ ৫৩
আহমেদ হুমায়ুন ❑ ৫৫
রাশেদ খান মেনন ❑ ৬০
শিরিণ আখতার ❑ ৬১
গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া ❑ ৬৪

স্মৃতি

অজিতকুমার গুহ ❑ ৬৬
আব্দুল্লাহ আল-মুতী ❑ ৬৯
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর ❑ ৭১

সাক্ষাৎকার

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর ❑ ৭৪

মাহবুব-উল আলম

১৩ই এপ্রিল ১৯৭১

এই দিনটি শুধু কুণ্ডেশ্বরী ঔষুধালয়ের অধ্যক্ষ নুতন চন্দ্র সিংহের হত্যার জন্য স্মরণীয় নয়, অন্য দুইটি হত্যার জন্যও স্মরণীয়।

ফজলুল কাদের চৌধুরীর পুত্র সালাহুদ্দীনের পরিচালনায় গুণ্ডা বাহিনী ও মিলিটারী সকাল সাড়ে দশটায় গহিরার বনেদী বিশ্বাস পরিবারে ঢুকে চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসের পুত্র কলেজ-ছাত্র ও ছাত্রকর্মী দয়াল হরি বিশ্বাসকে ধরে ফেলে এবং তাঁকে নির্মম ভাবে হত্যা করে।

অপর হত্যাগুলি অনুষ্ঠিত হয় রাঙ্গুনিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নিকটে।

চট্টগ্রাম শহরে তখন আর কোন প্রতিরোধ অবশিষ্ট ছিল না। কিছু মুক্তি-যুদ্ধা ও জনা ৫০ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটা দল দেখতে পেলেন দোহাজারী পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের কোন সংগঠন গড়ে উঠেনি। তাঁরা ঠিক করলেন: পাক-বাহিনীকে পাশ কাঠিয়ে কোন রূপে ভারতে ঢুকবেন।

তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন পটিয়ায়। ১১ই এপ্রিল রাত বারোটায় তাঁরা আশ্রয় থেকে বেরিয়ে পড়লেন। বান্দরবন ঘুরে তাঁরা চন্দ্রঘোনা পৌছলেন। তাদেও সাথে হাল্কা অস্ত্র-শস্ত্র এবং পথে তাদেও কয়েকটা খণ্ড যুদ্ধ করতে হয়েছে। এখন তাদের লক্ষ্য হলো পাহাড়-তলী। কিন্তু, রাঙ্গুনিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সাম্মুখে পৌছে তারা ১৩ই এপ্রিল পাক মিলিটারীর প্রায় ৫০০ জনের একটা বাহিনীর সংস্পর্শে এসে পড়লো।

মুক্তিযোদ্ধাদের 'ডিজপজিশন' ছিল : সম্মুখে একখানা জীপে ৯ জন, তম্মধ্যে ১ জন চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরীর জ্যৈষ্ঠ পুত্র ছাত্র নেতা সাইফুদ্দীন খালেদ চৌধুরী , ২ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সম্পাদক আবদুর রউফ, ছাত্রকর্মী গোলাম নবী, ৩ কানুনগোপাড়া কলেজের অধ্যাপক দিলীপ চৌধুরী , ৪ বোয়াল খালীর আওয়ামী লীগ কর্মী মো: ইউনুস, ৫ বোয়ালখালী থানা আওয়ামী লীগের সম্পাদক সেখ মোজাফ্ফর আহমদ, ৬ কলেজ ছাত্র ও ছাত্র-কর্মী ফিরোজ আহমদ রয়েছেন। জীপের পেছনে বাহিনী এবং সর্বশেষ দুই খানি ট্রাকে অস্ত্র-শস্ত্র ও মালপত্র। বিপদের উপর বিপদ। শত্রু এগিয়ে আসছে , অথচ গোলা-বারুদ প্রায় নি:শেষিত।

তবুও গুলি বিনিময় ছিল অবধারিত। একটা গুলিতে নিহত হলেন সাইফুদ্দিন খালেদ চৌধুরী , আর এক গুলিতে আবদুর রউফ।

গোলাম নবীর যে কি হলো কেউ বলতে পারেনা। কেউ তাকে আর দেখেনি। তবে, জানা গেছে এ বাচ্চা লাফিয়ে পড়ে ইলেকট্রিক খুঁটির আড়ালে আশ্রয় নিতে সক্ষম হয়।

জায়গাটি পাবর্ত্য ও জঙ্গলা। জঙ্গলে কিছু ই,পি,আর আত্মগোপন করে রয়েছিল। তারাও উপর থেকে পাঞ্জাবীদের উপর গুলি ছুঁড়ছিল। তারা এই বাচ্চাকে ডেকে নেয়। সে দলের সাথে ভারতে চলে যেতে সক্ষম হয়।

মিলিটারী পার্বত্য ও জঙ্গলা পথে আর অগ্রসর হতে সাহস করেনি। তবে জীপে ঘেরাও করে দিলীপ চৌধুরী, মো: ইউনুস, শেখ মোজাফফর আহমদ এবং ফিরোজ আহমদকে ধরে ফেলে। ফিরোজ আহমদের শরীরে ৫ জায়গায় লেগেছে গুলি।

ফিরোজ আহমদ বলেন, অন্তত: ২জন মিলিটারী হত হয়েছে দেখেছি।

আমাদের পিছ-মোড়া করে বেঁধে মাটিতে ফেলে রাখা হয়। নষ্ট করার মত সময় কারও হাতে ছিল না। মিলিটারী আমাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেষ্টা করে, তার পর গুলি করতে থাকে- প্রথমে দিলীপ। দ্বিতীয়ে মো: ইউনুস, তৃতীয়ে শেখ মোজাফফর আহমদ গুলি খেয়ে মারা পড়লেন। মৃত্যু শিয়রে জেনে আমার হুঁশ হলো যে লোকে বলে আমাকে পাঞ্জাবীর মত দেখায়। আমি চেঁচিয়ে বল্লুম: আমি পাঞ্জাবী।

তারা প্রশ্ন করলেন : কোথায় বাড়ি ? আমি বল্লুম : মহল্লা ফতুপুরা, জেলা গুজরাট। ঘটনা-চক্রে এই ঠিকানাটা আমার জানা ছিল। তারা বল্লে : তুইতে পাঞ্জাবী বলতে পারিস না ?

আমি জবাব দিলুম : কুড়ি বছর আগে আমি এদেশে চলে এসেছি। তখন একদম বাচ্চা। এখন বাংলাই আমার বুলি হয়েছে।

এর পর কি হতো বলা যায়না। কিন্তু অনবরত রক্ত-ক্ষরণে আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেল্লুম। পরে যখন জ্ঞান হলো: দেখি, ক্যান্টনমেন্টে আমি হাসপাতালে শুয়ে আছি। এখান থেকে আমাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখান থেকে আমি পালিয়ে গিয়ে আবার মুক্তি বাহিনীতে চলে যাই।

উৎস : লেখকের 'রক্ত আগুন, অশ্রুজল : স্বাধীনতা ' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি থেকে।

শিল্পী মুর্তজা বশীর
অংকিত লিনোকাট

একুশে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

মুহম্মদ এনামুল হক

'একুশে ফেব্রুয়ারী'—কোন বিশেষ দিন, ক্ষণ বা তিথি নয়,—একটি জাতির একটা জীবন্ত ইতিহাস। এ-ইতিহাস অগ্নিগর্ভ, যেন একটা সজীব 'লাভা'-স্রাবক আগ্নেয়গিরি; কখনও আন্তর্দাহে গর্জন করছে, আর কখনও চারদিকে অগ্নি ছড়াচ্ছে। সত্যি এ-ইতিহাস মৃত নয়,—জীবন্ত।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে বাঙ্লা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় এ-দেশের ছাত্র-সমাজকে যে শাহাদত বরণ করতে হয়, তারই ফলে বাঙ্লার 'ত্রিশ' লক্ষ ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিকের আত্মাহুতির মধ্য দিয়েই ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দেশে এসেছে স্বাধীনতা, আর তার সাথে সাথে এসেছে বাঙ্লা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মুক্তি। আজ মুক্ত-দেশে মুক্ত-আবহাওয়ায় দিনটি প্রতিপালিত হচ্ছে।

তাইতে এবারকার 'একুশে ফেব্রুয়ারী' আর রক্তরাঙা 'একুশে ফেব্রুয়ারী' নয়,—একেবারে রক্তস্নাত 'একুশে ফেব্রুয়ারী'। তার মূর্তিটিও ভিন্ন: এর এক চোখে অশ্রুর প্লাবন, আর অন্যচোখে সৃষ্টির বিদ্যুদ্দীপ্তি; এক হাতে পরাধীনতার ছিন্ন শৃঙ্খল, আর অন্য হাতে স্বাধীনতার বরাভয়-মুদ্রা; পশ্চাতে অনন্ত অন্ধকার বিলীয়মান, আর সম্মুখে অফুরন্ত আলোর হাতছানি।

অতএব, এবারকার 'একুশে ফেব্রুয়ারী' উপলব্ধির ফেব্রুয়ারী। এ-উপলব্ধি জীবনের, স্বাধীনতার, সৃষ্টির উপলব্ধি। এই দিনের সার্থকতা এখানেই,—অন্যত্র নয়। আসুন, আমরা এই 'অমর একুশ'কে আজ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রগত জীবনে উপলব্ধি করি।

আবুল ফজল

একুশের সংকল্প

একুশে ফেব্রুয়ারী আজ আমাদের ইতিহাসে পরিণত- এ ইতিহাসকে আমরা প্রতিবছরই স্মরণ করে থাকি, ভবিষ্যতেও স্মরণ করতে থাকবো। নিঃশ্বাস বায়ুর মতই আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে মাতৃভাষার সম্পর্ক এক সূত্রে বাঁধা। ভাষা আর সাহিত্যকে বাদ দিয়ে যে বাঁচা সে স্রেফ জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষা-কিন্তু মানুষ শুধু জৈবিক নয় সে আত্মিকও। মানুষ যে মানুষ, সে শুধু আত্মার অধিকারী বলেই। দেহের সঙ্গে তাই মানুষের আত্মার ও খোরাক চাই। সে খোরাক জোগায় মাতৃভাষা আর তার সাহিত্য। তাই মাতৃভাষা নিয়ে কোন আপোষ চলে না-যেমন আপোষ চলে না বেঁচে থাকার শাশ্বত দাবী নিয়ে। ঐ দাবী প্রাণের চেয়েও প্রিয়-প্রাণ দিয়ে তাই প্রমাণ করেছিলেন বায়ান্নোর তরুণ শহীদেরা। প্রাণ দিয়ে যে ইতিহাস তাঁরা রচনা করেছেন-রেখে গেছেন যে উত্তরাধিকার আমাদের জন্য, তাকে আমরা কতটুকু সার্থক করে তুলেছি সে প্রশ্নই আজ আমাদের সামনে বড় হয়ে উঠুক।

ইতিহাস শুধু একটা ঘটনা বা একটা মহৎ ত্যাগে সার্থক হয় না। প্রতিদিনের অনলস শ্রমের দ্বারাই তাকে করে তুলতে হয় সফল। মাতৃভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে একটি অগ্র পদক্ষেপ। বহু কাঁটা মাড়িয়ে ঝোপ ঝাড় পরিষ্কার করে ভাষার সদর রাস্তা তৈরী না হলে একটি মাত্র পদক্ষেপ আমাদের কোন গন্তব্যেই নিয়ে যাবে না, ঘুচবেনা আমাদের পরনির্ভরতা। আমাদের ভাষা এখনও আমাদের জীবনের বাহন হয়ে ওঠেনি-এখনও তার ব্যবহার হয়ে ওঠেনি সর্বত্রগামী। জীবনের সর্বস্তরে আমাদের মাতৃভাষা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে। শহীদদের এষণা ও অভীপ্সা রয়ে গেছে অপূর্ণ। এর জন্য দায়ী আমরাই-যারা প্রতিবছর ঘটা করে একুশে ফেব্রুয়ারী পালন করে বছরের একটি দিন মাতৃভাষার জন্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি। আর সারা বছর ধরে ভুলে থাকি মাতৃভাষার প্রতি আমাদের দায় ও দায়িত্ব! এ দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের বদলাতে হবে। মাতৃভাষাকে নিতে হবে সারা বছরের আর প্রতিদিনের ব্যবহারের বস্তু করে।

নদীর নাম বাংলা

॥ রনেশ দাশ গুপ্ত ॥

কত নাম আছে আমাদের অগণিত নদ-নদীর। বেছে বেছে নাম রাখা। অনামী জনতা রেখে দিয়েছে তাদের দেওয়া নামগুলি ভালবেসে। মায়রা যেমন সহজে স্বচ্ছন্দে দুলাল আর দুলালীদের নাম রেখে ফেলেনে, তেমনিভাবে নদীগুলিকে আদর করে দেওয়া এই সব নাম। শত শতাব্দীর মানুষ ডেকেছে এই নামে আদর করে। এই আদর আমাদের সমুদ্রমুখী নদ-নদীর কূলে কূলে আল্পনার মতো করে আঁকা। নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে চাঁদ সূর্যের রোশনির মতো এই আদর ঠিকরে ঠিকরে পড়ে!

এই সব আদরিনী নদীর মধ্যেই একটি নদীর নাম বাংলা।

বলাকা কাব্যের চঞ্চলা কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ সময়কে অদৃশ্য নদী বলে সম্বোধন করেছেন। 'বাংলা' নদীও তেমনি অদৃশ্য এক নদী। অদৃশ্য হয়েও বয়ে চলেছে কলনাদ করে নিরবধি। কলস্বিনী এই নদীও কখনও প্রচণ্ড কোলাহলময়ী। কখনও মধুর ভাষিনী। কখনও শান্তা। কখনও ক্রুদ্ধা। কখনও মন্থরা। কখনও দামিনী।

উপেক্ষিতা হলেও এর কাছেরু বিশ্রাম নেই। আদৃতা হলেও আলস্য নেই। উপেক্ষিত অনাদৃত মানুষের কাছে চির আদৃতা বলেই উপেক্ষিত ব্যক্তি আর গ্রামাঞ্চলের মানুষের মুখে

ভাষা যোগাবার ব্যাপারে এর কোন ক্লান্তি নেই। জনতার বুকে যখন ঝড় উঠে, তখন এই নদীও ঝড় হয়ে ওঠে। জনতা যেমন বাঁধ ভেঙ্গে এগিয়ে চলে আসছে এই নদীও, তেমনি বাঁধ ভেঙ্গে জনতার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসছে। এই নদীর নাম বাংলা।

এই বাংলা নদীকে ভালবাসি আমরা। আমাদের এই ভালবাসা যুগে যুগে কবিতার গানে এঁকে রেখেছে আমাদের আদর। আমাদের এই ভালবাসা যুগে যুগে সংগ্রামে উৎসারিত করেছে আমাদের চেতনাকে।

আমাদের এই ভালবাসা বছরে বছরে একুশে একুশে ফেব্রুয়ারীর মিছিলের শহীদী রক্ত ফলকে লিখেছে আমাদের একটি নদীর নাম—বাংলা। বাংলা মজুরের চেতনার ভাষা। বাংলা চাষীর চেতনার ভাষা। বাংলা লোক ভাষা, ব্যক্তির ভাষা, কুঁড়ে ঘরের ভাষা। বাংলা অনামীদের নাম।

শওকত ওসমান

একুশে ফেব্রুয়ারী

একদা আদিম বানর শ্রেণীর জন্তু অস্তিত্বের খোলস ছেড়ে ছেড়ে আজ বিস্ময়কর সভ্য মানুষে পরিণত। দু'টি মাত্র উপাদান তাকে এই সংগ্রামে সাহায্য করেছে। ভাষা এবং হাতিয়ার। এই দুই উপাদানের সহযোগিতা না পেলে সেই জন্তু তার পশুত্বের গণ্ডী পেরোতে সক্ষম হোত না। হাতিয়ার তাদের দিয়েছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উপায়। ভাষা সাহায্য করেছিল সংহতির মন্ত্র দিয়ে। দলবদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে না পারলে অস্তিত্বের সংগ্রামে মানুষ হেরে যেতো। ভাষা তাই সভ্য মনুষ্যসমাজ গঠনের প্রধান শর্ত। যুগযুগান্তের ঐতিহ্য ভাষার মাধ্যমেই অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে সামাজিক অগ্রগতির প্রতি পদক্ষেপে।

জাতির এমন অমূল্য সম্পদ রক্ষা তাই প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। আমাদের অনেকেই সে বিষয়ে আদৌ সচেতন নই। এই আত্মবিস্মৃতি জাতীয় আত্মহত্যার নামান্তর।

সালাম, বরকত ও অন্যান্য শহীদ ভাইয়েরা নিজেদের রক্ত দিয়ে সেই আত্মহত্যা থেকে আমাদের রক্ষা করে গেছেন।

আমরা কী তা কোনদিন ভুলে যাবো?

এমন অকৃতজ্ঞতার পাপ যেন আর কোন দিন আমাদের স্পর্শ না করে। একুশে ফেব্রুয়ারী তেমন শপথের দিন।

বীর বন্দনা

আহমদ শরীফ

মানুষের চিত্তের গভীরে আত্মরতি ও পরপ্রীতির বীজ নিহিত থাকে। আজন্ম অনুশীলনে আত্মরতি ক্রমে প্রবল ও প্রকট হয়ে মানুষের বিবেক ও মনুষ্যত্বকে আচ্ছন্ন ও আচ্ছাদিত করে ফেলে। তখন আমরা মানুষকে কেবল আত্মপরায়ণ ও স্বার্থপর রূপে প্রত্যক্ষ করি। এবং প্রাত্যহিক জীবনে আমরা ঐ মানুষকেই নিত্যাকার মানুষ বলে ভাবি। পরপ্রীতির প্রবৃত্তি থাকে গুহায়িত।

কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ঐ মানুষেই ক্ষণপ্রভার মতো পরার্থপর মানুষ দেখা দেয়। সেই বিদ্যুৎ দীপ্তিতেই সমাজ-সংসার প্রদীপ্ত হয়ে উঠে। কাছের মানুষ এবং পাশের মানুষও তখন স্ব স্ব অন্তরে সাজানো সলতেটি দেখতে পায়। তখনি অনুপ্রাণিত হৃদয়ে পরপ্রীতির, পরার্থপরতার ও আত্মোৎসর্গের শিখাটি জেলে নেবার বাসনা জাগে। এমনি করেই এক মনের আদর্শ অন্য মনে, এক হৃদয়ের মহত্ব অন্য হৃদয়ে, এক বুকের সাহস অন্য বুকে, এক কলিজার জ্বালা অন্য কলিজায়, এক অন্তরের প্রত্যয় অন্য অন্তরে, একজনের সংকল্প অন্যজনে সঞ্চারিত ও সংক্রামিত হয়।

তাই কৃতিত্ব থেকে যায় প্রথম ব্যক্তির, পথিকৃতের। কেননা জন-কল্যাণে ভয়ের পথে বিপদের মুখে যে প্রথম কদম বাড়ায়, নেতৃত্ব গৌরব তারই। প্রেরণার ও প্রবর্তনার উৎস সেই। অনুগত অনুসারী অনেক মেলে, দুর্লভ হচ্ছে আগে বলার, আগে করার ও আগে চলার মানুষ। যে মানুষ মানব কল্যাণে আত্মবিনাশের ঝুঁকি নিয়ে প্রথমে এগিয়ে আসে, সে-ই লোকবন্দ্য বীর, নেতা, অনন্য মানুষ, স্মরণীয় পুরুষ, বরেণ্য ব্যক্তি। তেমন মানুষের মৃত্যু জীবনের ইতি নয়, জীবনের উৎস, অমৃতের আকর, জীবনের মহিমময় ও সার্থক সমাপ্তি। তেমন মৃত্যু লক্ষ প্রাণের প্রসূতি, কোটি জীবনের ত্রাতা ও সংরক্ষক।

একুশে ফেব্রুয়ারীর শহীদেরা ছিলেন তেমন গণবন্দিত বীর ও জনকল্যাণ-কামী সেবক। স্বদেশে আজ স্বজাতি তাই তাঁদেরকে সগৌরবে স্মরণ করছে। গণ হৃদয়ে তাঁদের আসন চির ভাস্বর ও শুভ্রের হয়ে থাকবে, থাকবে প্রেরণার উৎস হয়ে।

বাঙলা ভাষার অক্ষর

—মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

বাঙলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করবার দাবী যখন প্রবল হয়ে উঠল তখন এক পক্ষ বলে উঠলেন, 'তা হলে বাঙলা ভাষা আরবী অক্ষরে লেখা হোক।' ইতিপূর্বে এই পরামর্শটা আরও দু' একবার শোনা গেছে, কিন্তু প্রস্তাবটা এতই অবিশ্বাস্য যে আমরা এর প্রতি ভালোমতো কান দেবারও প্রয়োজন বোধ করিনি। কিন্তু দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ মহল থেকে শোনাবার পর ও প্রস্তাবটাকে গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

কিন্তু ভাষাগত ও বৈজ্ঞানিক কারণে বাংলাকে আরবী হরফে যে লেখা চলে না, লিখতে গেলে বাংলা ভাষা আর বাংলা ভাষা থাকবে না সে কথাটা আমরা বুঝলেও যাঁরা বাংলা ভাষার সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত নন তাঁরা হয়তো বুঝতে পারেন না। কি কি কারণে বাংলা শব্দের আরবী অক্ষরে রূপান্তর সম্ভব নয়, তাই প্রথমে আলোচনা করছি।

বাংলা ও আরবী ভাষা দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন গোষ্ঠি থেকে উদ্ভূত। বাংলা ভাষা এসেছে প্রাচীন আর্য জাতির ভাষা থেকে। ভাষা তাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ এর গোড়ার ভাষার নাম দিয়াছেন ইন্দো ইউরোপীয় বা আর্য ভাষা এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠি নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে আর্য জাতি অধ্যুষিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আধুনিক ভাষাগুলিতে পরিণত হয়েছে। ইংরেজী, জার্মান, গ্রীক, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি এই ভাষা গোষ্ঠির অন্তর্গত। কিন্তু আরবী তা নয়। আরবী এসেছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূল

বা ভাষাগোষ্ঠী থেকে। তাকে বলে সেমেটিক। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠী থেকে এই সেমেটিক ভাষা গোষ্ঠীর উৎপত্তি ও পরিপুষ্টির ধারা সম্পূর্ণ আলাদা। এর জন্ম আলাদা, ইতিহাস আলাদা। তাই এই দুই ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই দুই ভাষা গোষ্ঠীর সাধারণ কতগুলি রীতি ও প্রকৃতি আলোচনা করলে আমার এ কথাটা স্পষ্ট হবে।

আর্যভাষা থেকে উদ্ভূত সমুদয় ভাষাই লেখা হয় বাম দিক থেকে। কিন্তু সেমেটিক ভাষা অর্থাৎ আরবী লেখা হয় ডান দিক থেকে। বাংলা, ইংরেজী, ফারসী, সংস্কৃত শব্দের একই মূল খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু বাংলা ও আরবীর একই মূল খুঁজে পাওয়া যায় না। আর্য ভাষাগুলিতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ আলাদা। অর্থাৎ স্বরধ্বনির জন্য আলাদা বর্ণ আছে। কিন্তু আরবী ভাষায় স্বরবর্ণ নেই, আছে স্বর ধ্বনি বোঝবার জন্য কয়েকটি চিহ্ন মাত্র। বলা বাহুল্য সেগুলি বাংলা আ'কার ই'কার চিহ্নের মত নয়। এবং সব চেয়ে বড় কথা হল বাংলা বর্ণ মালার উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণ রীতির সঙ্গে ইংরেজীর যতটা মিল আছে, আরবীর ততটাও নেই। এজন্য বাংলা উচ্চারণ ইংরেজীতে মোটামুটি লেখা যায়। কিন্তু আরবীতে 'নৈবচ' একেবারেই না। এতে দেখা যায় আরবী ভাষায় চাইতে ইংরেজীই আমাদের কাছের ভাষা।

চেষ্টা করেই দেখা যাক, লেখা যায় কিনা। একজন "এই সংসারের লক্ষ্মী মেয়েটি মরে গিয়াছে" এই কথাটি আরবী অক্ষরে লিখবার চেষ্টা করে দেখেছিলাম। কিন্তু কৃতকার্য্য হয়নি। কেননা ধ্বনিগুলি প্রায় সবই বিকৃত হয়ে যায়। আরেকটি বাক্য নেয়া যাক। "মেয়েটিকে ওর মা খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে এলেন।' লিখুন আরবী অক্ষরে, কথাটা দাঁড়াবে এই রকম, মিরি তিকি ওয়ার (বা উর) মা খা-ইই দা-ইয়ি ঘুম পারিয়ি ইলিন। কিন্তু এরকম হলে কি কেউ বাংলা কথাটির মানে বুঝতে পারবেন ?

বাঙলা কয়েকটি বর্ণের উচ্চারণ আরবী বর্ণমালায় একবারে নেই ; যেমন ঘ, ছ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ড়, থ, ধ, প, ভ ইত্যাদি। বিশেষ করে ট,

ড, ড়, ইত্যাদি কিছুতেই আরবীতে লেখা যায় না। ড় লিখতে না পারলে আমরা গাড়ী আর শাড়ী লিখব কেমন করে? এই কারণে হিন্দীতে আরবী অক্ষর প্রবর্ত্তনের পর অর্থাৎ উর্দু ভাষায় কয়েকটি অতিরিক্ত বর্ণ যোগ করা হয়েছে, যেমন পে, ডাল, টে ইত্যাদি। কাজেই উর্দু বর্ণমালা আরবী বর্ণমালার অনেক খানি পার্থক্য রয়ে গেছে আর আমাদের যাঁরা আরবী বর্ণমালা গ্রহণ করতে বলেন, তারা আসলে এই উর্দু বর্ণমালাই উদ্দেশ্য করে বলে থাকেন। কিন্তু এই উর্দু বর্ণমালাতে ও বাঙলা উচ্চারণগুলি ঠিক মতো লেখা যাবে না, বিশেষ করে ক্রিয়া পদগুলি লিখতে গেলে প্রতি পদেই গোলমাল হয়ে যাবে। এক কথায় বলতে গেলে বাংলা ভাষা উর্দু অক্ষরে লিখতে গেলে বাংলা ভাষা আর বাংলা ভাষা থাকবে না, গোটা ভাষাটাই উর্দু হয়ে যাবে। তা ছাড়া তখন নূতন নূতন উর্দু এবং আরবী, ফারসী শব্দ উর্দুতে লিখিত 'বাংলাতে আনতে আর কোনোই বাধা থাকবে না এবং এর ফলে কালক্রমে বাঙলা ও উর্দু ভাষার আর কোনই পার্থক্য থাকবে না।

এই সম্ভাবনা আরবী হরফবাদীরা দেখতে পেয়েছেন বলেই তাঁরা বলেছেন- "মূল সমস্যা হরফ লইয়া, ভাষা নহে.....বাঙলা হরফের পরিবর্ত্তন আনার চেষ্টা করা উচিত। তাহা হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে।" এই 'ঠিক হইয়া যাইবে' কথাটার অর্থ কী ? এর অর্থ কি এই নয় যে বাঙলা ভাষা আরবী অর্থাৎ উর্দু অক্ষরে লিখতে আরম্ভ করলে পরে কালক্রমে এই ভাষাটাই উর্দু হয়ে যাবে। সেই কারণেই তাঁরা বলেছেন, ভাষাটা বড় সমস্যা নয়, সেটা আপনিই বদলাবে, মূল সমস্যা হরফ লইয়া" হরফ বদলালে আর কোন সমস্যাই থাকবে না। এর উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

আরবী হরফের পক্ষে যাঁরা ওকালতী করছেন, তাঁদের ধারণা "বাঙলা ভাষার প্রায় শতকরা ৯০টি শব্দ ফারসী, উরদু, আরবী এমন কি পাঞ্জাবী হইতে উদ্ভূত।" এ ধারণা কারা তাঁদের মনে সৃষ্টি করেছে জানি না। যেই করে থাকুক, তারা এই মতাবলম্বীদের বন্ধু নয়।

কেন না, তার বলে নিতান্ত ভিত্তিহীন একটি উক্তি তাঁরা করতে বাধা হয়েছেন। আরবী, ফারসী শব্দ বাঙলায় অবশ্য কিছু আছে, কিন্তু ওগুলে দেখা যায় বাঙলা ভাষায় মোট বিদেশী শব্দই (আরবী, ফরসী ইংরেজী, পর্তুগীজ) সব নিয়ে শত করা ৫টি ৬টির বেশী নয়। এমতাবস্থায় বাঙলার শতকরা ৯০টি শব্দ কী করে আরবী ফারসী হতে পারে? আরবী হরফবাদীদের মনে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে বলেই তাঁরা ভেবেছেন, বাঙলা ভাষাকে অতি সহজেই আরবী বা উরদু অক্ষরে রূপান্তরিত করা যাবে এবং তা হলেই সব সমস্যা মিটে যাবে, অর্থাৎ দুটি ভাষা এক হয়ে যাবে, আর কোন বিভেদ থাকবে না। তাঁদের উদ্দেশ্য যে সাধু তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁরা বাঙালী ও পাঞ্জাবী কী ভাবে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাই চিন্তা করেছেন। সে জন্য তাদের আমরা প্রশংসা করি, কিন্তু মৈত্রী প্রতিষ্ঠার উপায় এ নয়। এতে করে শুধু অতিরিক্ত তিক্ততারই সৃষ্টি করা হবে।

বাঙলা ভাষার বর্ণমালা জটিল ও অবৈজ্ঞানিক এই অভিযোগ উত্থাপন করে কেউ কেউ বাঙলা বর্ণমালার পরিবর্তনের সোপারেশ করে থাকেন। তার জবাবে স্পষ্ট বলা দরকার যে বৈজ্ঞানিক বর্ণমালা কাকে বলে এঁরা তাই জানেন না। বস্তুত বাঙলা ভাষার মতো বৈজ্ঞানিক ও সুপরিকল্পিত বর্ণমালা পৃথিবীর যে কোন সভ্য ভাষাতেই দুর্লভ। বৈজ্ঞানিক বর্ণমালার অর্থ হল, যে বর্ণমালার অন্তর্গত বর্ণগুলির উচ্চারন নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় এবং লিপি উচ্চারণ অনুসারী এই দিক থেকে বাঙলা ভাষা ও বর্ণমালা খুবই উচ্চ স্থানের দাবী করতে পারি। বাঙলা ভাষার প্রতিটি বর্ণের উচ্চারণ নির্দিষ্ট এবং সব যায়গাতে তারা একই রকম উচ্চারিত হয়। ইংরেজী "C" অক্ষরটি কখনও স, কখনও চ, কখন ও ক, এই রকম বিভিন্ন ধ্বনি বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আরও অনেক ব্যঞ্জনবর্ণ এবং সবগুলি স্বরবর্ণের উচ্চারণই ইংরেজী ভাষায় এরূপ পরিবর্তনশীল। বলা বাহুল্য, তাতে নূতন শিক্ষার্থীদের খুবই অসুবিধা হয়ে থাকে। But বাট হয় অথচ Put পাট কেন হয় না, তার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। তার জন্য

হচ্ছে। আমাদের ভাষা কমিটির সোপারেশেরও তাই উদ্দেশ্য। অবশ্য তার মধ্যে কেউ কেউ বাস্তব দৃষ্টি হারিয়ে ভাষাটাকে রাতারাতি গুড়ো করে দেওয়ার জন্য গদা লণ্ডড় হাতে রুখে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু ভাষার সংস্কার এভাবে হতে পারে না।

মোট কথা বাংলা লিপি ও বর্ণমালায় যৎসামান্য ত্রুটি যা আছে, তা অতি নগণ্য এবং সহজেই সংশোধন সাপেক্ষ এবং এই অল্প বিস্তার ত্রুটি সত্ত্বেও এটি দুনিয়ার সেরা বর্ণমালা ও লিপি, এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কোনো যুক্তি সংগত কারণ নেই।

বাংলা প্রচলন প্রসঙ্গে—

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

শুনতে আজ যতই অবাস্তব বা কৌতুককর মনে হোক না কেন বাংলা দেশের মুসলমানদের বুদ্ধিজীবী মহলে সত্যি সত্যি তর্ক উঠেছিল বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা কি তা নিয়ে। সে তর্কের মিমাংসাটা বড় কথা নয়। মিমাংসা কি হবে সেতো আমাদের জানাই ছিল, তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এটা যে তর্ক উঠেছিল। আর এখন সেই একদা তর্কনিমুক্ত সংশয়চিত্ত সম্প্রদায়ের বংশধরদের হাত দিয়েই যে বাংলা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্ব প্রথম ব্যবহৃত হতে যাচ্ছে—এর ভেতর ইতিহাসের প্রসন্ন পরিহাস কুশলতার নিদর্শন আছে কিনা জানি না, কিন্তু একটি বিবর্তনধারার বিশেষ স্তরের নির্দেশনা যে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাংলাকে অস্বীকার করবার মত চরম প্রস্তাব যখন উঠেছিল তখন তার পেছনে ছিল বড় রকমের একটা অভিমান। বাঙালী মুসলমান যে রীতিতে কথা বলে, যে প্রণালীতে দিনযাপন করে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে তার সামান্যতম স্বীকৃতিও ছিল না। এ নিয়ে অভিযোগ ছিল, এবং সেই প্রতিকারহীন অভিযোগই পুরে কান্না-চাপা অভিমানে রূপান্তরিত হয়। তখনই রব উঠে এ ভাষা আমার নয়, যে আমাকে স্বীকার করে না। আমিও তাকে স্বীকার করি না। ভাষা-সাহিত্যে মুসলমানদের অস্বীকৃতির কারণ কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক কি সাহিত্যিক ছিল না, ছিল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক। দেশের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে মুসলমানরা প্রবেশাধিকার পায় নি, তার জন্যেই সাহিত্যের দর্পনে ধরা পড়েনি তাদের মুখের কথা, ঘরের ছবি।

অবস্থাটা চরম ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু স্বভাবতঃই চূড়ান্ত ছিল না। তাই তার রদবদল ঘটেছে। ধীরে ধীরে হলেও সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমান প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। আত্মপ্রতিষ্ঠা যত বেড়েছে অভিমান তথা হীনমন্যতা গুটিয়ে গেছে সেই পরিমাণে। পাকিস্তান অর্জন সেই প্রতিষ্ঠার্জনেরই ফলশ্রুতি। কিন্তু বিবর্তনের রেখা সেখানে এসেই শুদ্ধ হয়ে যায়নি। বাংলা প্রচলনের সার্বজনীন আগ্রহ ঐ বিবর্তন ধারারই একটি পরবর্তী স্তর।

ঘরের ভাষার সঙ্গে বাইরের ভাষার পার্থক্যটা পরাধীনতার আমলে বাঙালী মুসলমানদের কাছে লজ্জাজনক ঠেকত, মনে হত ঐ তফাৎ আমরা যে পিছিয়ে আছি এই সত্যটিকেই উদ্ঘোচিত করেছে। সেই দূরত্বটা কিন্তু আজো ঘোচেনি, আজো আমরা বিভক্ত সত্তা, গৃহে যে ভাষার কথা বলি আপিসে কি কলেজে তা ব্যবহার করবার সুযোগ পাই না। ঘরের বাংলার সাথে বাইরের ইংরেজীর যে তফাৎ সেটা শুধু দুটি ভাষার নয় দুটি ভিন্ন ভিন্ন জীবনপ্রণালীরও। সহরের মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত স্কুলটির সঙ্গে বিদ্রোৎসাহীদের পরিচালিত ইংলিশ প্রিপারেটরী স্কুলটির যতটা দূরত্ব, দুই জীবনপ্রণালীর দূরত্বও ততটাই। প্রথমটি দরিদ্র, দ্বিতীয়টি ধনী; প্রথমটি সব সময়েই অন্ধকারাচ্ছন্ন, দ্বিতীয়টি নিয়ত দেদীপ্যমান। কিন্তু মুস্কিলের কথা এই যে, ডঃ জ্যাকিল ও মিঃ হাইডের এই দুই স্বতন্ত্র পরিচয় নিয়ে অনেক ডঃ জ্যাকিলের নিজের তেমন লজ্জা নেই, নেই অস্বস্তিও। এঁদের বরং লজ্জা বাংলা ভাষাটা অপরিণত বলে। অথচ এই লজ্জা পাওয়াটাই সবচেয়ে বড় লজ্জার ব্যাপার হওয়ার কথা ছিল। কেননা ভাষা অপরিণত হোক কি অপরিপক্ক হোক, সে আমারি ভাষা, আমার পরিচয়ই সে বহন করছে। সে পরিচয়ের জন্য কাকে দায়ী করব, দোষ দেব কাকে? দোষ যদি দিতে হয়তো সে আমাদের নিজেদেরই।

ভাষার স্বভাবে অবশ্যি একটা দ্বিত্বও আছে। একদিকে সে যেমন অন্যের সঙ্গে আমাদের সংশ্লিষ্ট করে অন্যদিকে আবার তেমনি পারে বিশ্লিষ্ট করতেও। ভাষার সাহায্যে আমরা যেমন মনের ভাব প্রকাশ করে থাকি, তেমনি আবার মানের দিক থেকে যে আমরা অন্যের চেয়ে

উঁচু সেই সত্যটিকেও উঁচু করে ধরে দেখাতে চাই। শোনা যায়, যে সমস্ত দেশে উচ্চ-নীচের অন্যসব ভেদগুলো দূর হয়ে গেছে সেখানে শ্রেণী পরিচয় ভাষাকেই শেষ অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে। কে কি রকম শব্দ ব্যবহার করে, কি করে শব্দ উচ্চারণ করে সেটাই নাকি কে উচ্চ কে নীচ তা ধরবার একমাত্র উপায়, তা নাহলে কাপড়-কেতায়, বাড়ী-ঘরে তাদের ভেতর আর কিছু ইতর বিশেষ নেই। হতে পারে ইংরেজী-বাংলার বর্তমান কারবারটা ভেদাভেদের নিশান হিসাবেই গৌরব পাচ্ছে, হতে পারে বাংলার আপাতঃ অপ্রচলন ঐ নিশানকে উচ্চীয়মান রাখবার বাসনাতেই গোপনে লালিত। কিন্তু বাংলার প্রচলন হলেই যে নিশান ভূলুণ্ঠিত হবে এমন ভয় অমূলক; তখনো ধনী-নির্ধন শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ব্যবধান এই বাংলা ভাষারই বিভিন্ন রকম ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাবে।

এবং পাবে যে সত্যটিকে আমাদের মনে রাখা আবশ্যক। বাংলা প্রচলন যে আমাদের সকল গলদের অবসান ঘটাতে পারে না, একথা যেন অতি উৎসাহের ডামাডোলে আমরা ভুলে না বসি। আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলো এখন যদি 'ক্লার্ক' তৈরী করার কাজে নিয়োজিত থাকে তো তখনকার বিশ্ববিদ্যালয় 'কারনিক' তৈরী করবে - এই পর্যন্তই। বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা দিলে শিক্ষা ব্যাপকতর হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু অজ্ঞতার অন্ধকারটা রাতারাতি অবলুপ্ত হয়ে যাবে এমনটা আশা করা অসঙ্গত। বাংলা প্রচলন একটা উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য শিক্ষাকে সহজ ও স্বাভাবিক করা। আসলে শিক্ষাটাও উদ্দেশ্য নয়, মূল উদ্দেশ্য জীবনকে সমৃদ্ধতর করে তোলা সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা প্রচলন স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাপার নয়, শিক্ষা সংস্কারের পথে একটা ধাপ মাত্র।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার একটা সমালোচনা এই যে, এতে নব্য-শিক্ষিতের মধ্যে এক ধরণের উৎকেন্দ্রিকতা সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষাটা আলো না হয়ে তাপ হয়ে দেখা দিচ্ছে, ফলে নতুন যিনি শিক্ষিত তাঁর মধ্যে এক রকমের আহমিকা বাসা বাঁধছে। তাই দেখা যায় যিনি উচ্চশিক্ষিত বিশেষ করে বিদেশপ্রত্যাগত, তাঁর সঙ্গে তাঁর পিতামাতা আত্মীয়জনের

সম্পর্কটা তেমন ঘনিষ্ট নয় যেমনটা প্রত্যাশিত ছিল। বিদ্যা, আসবাব পত্র ও স্ত্রীকে (সন্তান সন্ততিসহ) নিয়ে তিনি একটা দ্বীপ গড়ে তুলেছেন যেখানে সহকর্মী কি বন্ধুবান্ধবরা আসতে পারেন তাঁরা ও দ্বীপের বাসিন্দা বলে, কিন্তু মূল ভূখণ্ডের অধিবাসী ঘনিষ্ট আত্মীয়স্বজন যেখানে যাতায়াতের কায়দা কৌশলের খবর আদৌ রাখেন না। ব্যাপারটার নিন্দা চলছে। কিন্তু নিন্দাভাষণে যতই উত্তেজিত বাক্য নিক্ষেপ করি না কেন, একটা সত্য অবচলিত থেকে যায় যে, এই উৎকেন্দ্রিকতার সূচনা সেদিন থেকেই হয় যেদিন শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে নবীন জ্ঞানার্থী বিদেশী ভাষাকে বেছে নেয়। তখন থেকেই শিকড়গুলো কাটা শুরু হয়েছে, তারপর যত বাড়ছে তার জ্ঞানের বহর তত কমছে পিতার সঙ্গে তার সম্পর্ক। দেশের ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অজ্ঞ, এবং সে অজ্ঞতা নিয়ে প্রকারান্তরে গর্বিত এ ধরণের শিক্ষিত লোক আমাদের দেশের নিজস্ব সম্পদ। শিক্ষাজীবনে মাতৃভাষা চালু হলে এই গলদটা আগের মত প্রশ্রয় পাবে না এটা আশা করা যায়।

অন্যান্য যুক্তিও আছে। সেগুলো সুপরিচিত। বিরুদ্ধ যুক্তিগুলোও সকলেরই জানা। একদিক থেকে এই বাকবিতণ্ডা বোধ করি অর্থহীন। কেননা শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা যে তার জায়গা দখল করবেই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, সে কোন তর্কের অপেক্ষা রাখবে না। দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন যাঁরা স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং যে বিদেশীরা বাধা দিয়েছেন তাঁদের উভয় পক্ষেরই জানা ছিল পরিণামে এ দেশ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায় করে নেবেই। প্রশ্ন শুধু কবে এবং কি ভাবে। বাংলার বেলাতেও তাই। কবে চালু হবে এবং কি চোহরায় চালু হবে জিজ্ঞাস্য সেইটেই। তবে চালু করার পথে যে অন্তরায়গুলো আছে উৎসাহের আতিশয্যে তাদেরকে অতিরিক্ত সহজ বলে বিবেচনা করলে ভুল করা হবে। লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে শিক্ষার মানের কোন অবনতি না ঘটে। তাছাড়া বাংলা ভাষার এম-এ ক্লাসে শিক্ষা দেওয়াটা, কি কেউ এম-এ পরীক্ষা দিলে সোৎসাহে তাকে পাশ করিয়ে দেওয়াটা বড় কিছু কীর্তি নয়, তার চেয়ে অনেক

বেশী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল বিজ্ঞান, কারিগরি ও চিকিৎসাবিদ্যার নানান শাখায় বাংলাকে প্রচলিত করা। আসল পরীক্ষা সেখানে। তদুপরি জ্ঞান জিনিষটা যেহেতু কোন একটা অবস্থায় স্থির হয়ে নেই, তার বুদ্ধি যেহেতু বসে থাকে না কেবলি বেড়ে ছুটে বেড়ায় তাই এখন এই মুহূর্তে যে বই গুলো লেখা আছে সেগুলো লেখা আছে সেগুলো তরজমা করে ফেললেই বুঝি ছোওয়া হয়ে গেল ভাববার কারণ নেই, আমাদেরও প্রতিনিয়ত ধাবমান শব্দব্যস্ত থাকতে হবে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট নিশ্চলতা অপমৃত্যুরই নামান্তর।

যেহেতু বাংলা প্রচলনে বিলম্ব ঘটেছে, প্রতিবন্ধকতা ও বিরোধিতাও আছে তাই এটা খুবই সম্ভব যে, বাংলা যখন চালু হবে তখন সেই সুযোগে তার সঙ্গে কিছু অন্ধ ভাবাবেগ ও অবুঝ অভিমান উল্লাসে উত্তেজনায় ফুলে ফেঁপে উঠবে।' 'সেই আবেগ ও অভিমান যদি অহমিকা ও আত্মতৃপ্তি এনে দেয়, আত্মবিমুগ্ধচিত্তে যদি আমরা মনে করি বসি ঐ প্রচলনেই সব পাওয়া হয়ে গেছে, আর কিছু চাইবার নেই তাহলেই হবে বিপদ। কেননা এমন আশঙ্কা অমূলক নয় যে, তাতে আমরা চলমান বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্রাম্য হয়ে পড়ব। গ্রাম্যতাকে পরিহার না করলেই নয়। দেখতে হবে বাংলার নাম করে অন্ধকার যেন স্বেচ্ছাচারী না হয়ে উঠে। বাংলা মাধ্যম যাতে অজ্ঞতার অনুহাত না হয়ে দাঁড়ায়। মূঢ়তাকে যেন আমরা কিছুতেই প্রশ্রয় না দেই।

একুশে ফেব্রুয়ারী | আনিসুজ্জামান

একুশে ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের জনগণের আত্মোপলব্ধির মহত্ত দিন। জাগ্রত চৈতন্যে এইদিন বাঙালি তার স্বরূপ উপলব্ধি করেছিল। এই আত্মসাক্ষাত্-কার লাভ শুধু তার সাংস্কৃতিক জীবনেই নতুন প্রাণস্পন্দনের সূচনা করে নি, তার সর্বব্যাপী আত্মবিকাশের প্রেরণা এনে দিয়েছিল।

একুশে ফেব্রুয়ারী এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরও এক রক্ত-চিহ্নিত দিন। সংগঠিত ও সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছ থেকে নিরস্ত্র জনসাধারণের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম এই দিনে সূচিত হয়েছিল।

এই উভয় ধারাই বাংলাদেশের মানুষকে মুক্তি আন্দোলনের দ্বারপ্রান্তে এনে দিয়েছিল। স্বাধীনতার সর্বালোকে একুশে ফেব্রুয়ারীর মহিমা আজ তাই নবতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

একুশে ফেব্রুয়ারীর আন্দোলনের পশ্চাতে যে গণতান্ত্রিক চেতনা সক্রিয় ছিল তার কথা ভুলে যাওয়া উচিত হবেনা। সেদিনের একটা আওয়াজ ছিল : অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।' পরে 'অন্যতম' শব্দটি বর্জিত হলেও বাংলাকে কখনও একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে দাবী করা হয় নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ পরবর্তী কালেও তার এই গণতান্ত্রিক উপলব্ধি ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে।

ইংরেজি নাম-ফলক টেনে ফেলে দেওয়া কিংবা গাড়ির ইংরেজি নম্বর-ফলক লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়া অনেকটা পরে একুশে ফেব্রুয়ারীর উৎসবের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫২ সালে কিন্তু কোন ভাষার প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব প্রকাশিত হয় নি।

নিজের ভাষাকে শ্রদ্ধা করতে শিখলে অন্যের ভাষাকেও শ্রদ্ধা করতে শেখা হয়। অন্য ভাষার প্রতি আন্তরিক বিরাগ মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার পরিচয় বহন করে না। আমরা ইংরেজি শিখব না বলে পণ করেছি। বাংলা শিখব বলে সঙ্কল্প করি নি। একুশ বছর আগে যাঁরা বাংলাভাষার জন্যে

আত্মদান করেছিলেন কি যাঁরা এই সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা তাঁদের মধ্যে বিকশিত হয়েছিল অত্যন্ত সচেতনভাবে। পরে এই ভালোবাসা আমরা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দিয়ে উত্তরাধিকার করেছি। গত বিশ-একুশ বছরে বাংলাভাষার প্রয়োগ কিছু বেড়েছে, সন্দেহ নেই। তুলনামূলকভাবে অপপ্রয়োগ অনেক বেড়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারীর পোষ্টারে-ফেষ্টুনে রচনায়-বিজ্ঞাপনে ভুল বানান ও ভুল বাক্য অলঙ্কিতভাবে এখন আত্মপ্রকাশ করছে। বিশ বছর আগে তা প্রায় অভাবিত ছিল। স্বাধীনতালাভের পর সরকারীভাবে বাংলাভাষার কার্যকর ব্যবহারের কথা ঘোষিত হয়েছে। এক একুশে ফেব্রুয়ারী থেকে অন্য একুশে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আমরা এক্ষেত্রে অগ্রগতির হিসেব নিকেশ করব। বলা যেতে পারে, কার্যকর ব্যবহারের পক্ষে অনেক বাধাই এই এক বছরে দূর করা সম্ভব হয়নি। বাংলা টাইপ রাইটার যথেষ্ট আমদানি হয় নি। যেখানে টাইপরাইটার এসেছে, সেখানে হয়তো টাইপিস্ট নেই। যেখানে টাইপিস্ট আছে, সেখানে হয়তো স্টেনোগ্রাফারের দরকার ছিল। উঁচু ক্লাসের পাঠ্য বই এই এক বছরে তেমন লেখা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু ক্লাসে বাংলায় অধ্যাপনার কাজও তেমন হয়নি।

সব মিলিয়ে এবারের একুশে ফেব্রুয়ারীতে গর্জমান বক্তৃতার উপকরণ তৈরি হয়েছে। কিন্তু আরো একটা কথা মনে পড়ছে। ১৯৭২ সালে—বাংলা ভাষা একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে ঘোষিত হবার পরই—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন কলেজের বি, কম, পরীক্ষার্থীদের দাবীতে তাদের মাতৃভাষার পত্রটি পরীক্ষা থেকে উঠিয়ে দিতে হয়। শুধু তাই নয়। বি, এ, পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচীতে রবীন্দ্রনাথ-মধুসূদনের কাব্যগ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত রাখার "কঠিন সিদ্ধান্ত" সম্পর্কে আপত্তি জানিয়েও দৈনিক পত্রিকায় নিবেদন প্রকাশ হয়। ১৯৫২ সালে বাংলাভাষার জন্যে ছাত্রেরা প্রাণ দিয়েছিল। ১৯৭২ সালে বাংলাভাষার পরীক্ষা সংক্ষিপ্ত ও অদৃশ্য করার জন্যে ছাত্রেরা সংগঠিত হয়েছে। ভাষা সম্পর্কে উদাসীন্যের পরিচয় আমরা প্রতিদিন দিচ্ছি—কথায়, লেখায়, আচরনে। কেউ হয়তো বলবেন, এটা একটা সাময়িক বিকার মাত্র। হয়তো তাই। কিন্তু বিকারও তো ব্যাধির লক্ষণ। ব্যাধিগ্রস্ত দেহ নিয়ে বেশি দূর চলা যায় না, বিশেষতঃ দুর্গম পথে। ব্যাধিগ্রস্ত চিত্ত নিয়ে আমরা কতদূর অগ্রসর হতে পারব?

আহমেদ হুমায়ুন

●

চেতনার কেন্দ্রমূলে একুশে

ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা ও ঐতিহ্য আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে আজও সমৃদ্ধ করে চলেছে অভাবিত দানে অবিস্মরণীয় পুরস্কারে। ব্যক্তি এমন কি জাতির স্মৃতিপত্রে ধুলোর পুরু আস্তরণ জমিয়ে দেবার জন্যে আঠার বছর ঢের সময়। অতি প্রিয়জনের বিয়োগ বেদনাও মানুষ ভুলে যায় বছর না ঘুরতে, এই মুহূর্তে যা দুঃসহ ক্ষতি বলে মনে হয় তাও সয়ে যায় অভাবনীয় স্বল্প কালের মধ্যে। আসলে, অতীতকে দ্রুত বিস্মরণই মানব ধর্ম স্মৃতির ঝুলি যুগ যুগ ধরে ভারাক্রান্ত করতে থাকলে মানুষের পক্ষে সামনে চলাই দুষ্কর হয়ে উঠত। কিন্তু তাহলেও এমন কিছু স্মৃতি আছে, যন্ত্রনা আছে যা মানুষ সহজে ভুলতে চায়না, ইচ্ছা করলেও পারেনা যথানিয়মে দিন পঞ্জির পাতা উলটাতে উলটাতে থমকে দাঁড়াতে হয়, দাঁড়িয়ে ভাবতে হয় একটি তারিখের দিকে চোখ রেখে। নতুন করে উদ্বোধন করতে হয় পুরণো যন্ত্রনার, বিস্মৃত বেদনার।

একুশে ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাংলার ইতিহাসে ঠিক অমন একটি তারিখ। মানুষ কিছুতেই ভুলছে না, বিস্মৃত হতে পারছেনা সে দিনের স্মৃতি, শিক্ষা, ঐতিহ্য সব কিছু। কিন্তু, একুশে ফেব্রুয়ারী শুধু মাত্র একটি শোকভারাক্রান্ত দিন নয়, পুষ্পের সমারোহে সমাধি সাজাবার তারিখ নয়, একুশের আবেদন ও ব্যাঞ্জনা আমাদের অনেক অনেক বেশী, তার প্রভাব গভীর সঞ্চারী।

একুশে ফেব্রুয়ারীর শিক্ষা পূর্ব বাংলার গোটা গণজীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত, নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে সে কথা আগেই বলেছি। যতদিন মানুষ দুঃখী, বঞ্চিত থাকবে ততদিন একুশে পূর্ব বাংলার জনচিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকবে এ কথা নিঃসংশয়েই বলা যায়। গত আঠার বছরের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি অবস্থান করেছে আমাদের চেতনার কেন্দ্রমূলে।

পূর্ব বাংলার জনজীবনে ভাষা আন্দোলনের এই সর্বব্যাপী প্রভাবের বিস্তৃত বিশ্লেষণে না যেয়ে আমার আলোচনা একটি মাত্র ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখবো সে হচ্ছে সাহিত্য। সাহিত্যকে তার ধর্মস্থিত করতে, সৃষ্টির প্রেরণাকে সহস্র মুখী করে তুলতে একুশে ফেব্রুয়ারী যে কি বিরাট ভূমিকা পালন করেছে গত আঠার বছরের সাহিত্য আন্দোলনে তার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

শহীদ দিবসকে উপলক্ষ্য করে প্রতি বছরই অগুণতি সাহিত্য সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে ঢাকা এবং অন্যান্য শহরকেন্দ্র থেকে। যতই বছর যাচ্ছে এ ধরণের সংকলনের সংখ্যা ক্রমশই স্ফীত হচ্ছে। প্রধানতঃ ছাত্র সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত স্মারক পত্রিকাগুলোকে আপাত দৃষ্টিতে সাময়িক উদ্যোগের ক্ষণজীবি ফসল বলে মনে হলেও একুশের সাহিত্য সম্ভার আসলে আমাদের সাহিত্য জীবনের অন্যতম প্রধান উপকরণ। পূর্ব বাংলায় ভাল সাহিত্য পত্রিকার সংখ্যা নগন্য। এর উপর ছিল কড়া বিধি নিষেধ। এর ফলে সাহিত্য চর্চার পথে যে বাধা উত্তীর্ণ হয়েছিল তা দূর করে দিয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারীর সাহিত্যমূলক উদ্যোগ। অগুণতি স্মারক সংকলনে লেখে নবীন প্রবীন উভয় গোষ্ঠীর লেখকরাই অজস্র লিখে সারা বছরের আংশিক নিষ্ক্রিয়তার ক্ষতি পুষিয়ে দেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের

বীর শহীদদের রক্ত সেই যে আমাদের সৃষ্টিশীল কর্মের উৎস উন্মুক্ত করে দিয়েছিল তার ধারা আজও বয়ে চলেছে প্রবলতর আর ব্যাপকতর খাতে।

কিন্তু একুশের সাহিত্য একান্তভাবেই প্রসঙ্গ কেন্দ্রিক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার নয়। একথা বলাই বাহুল্য যে একুশে ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত সকল সাহিত্য সংকলন অথবা সকল রচনাই চিরন্তন সৃষ্টির দাবীদার হতে পারবে না। সেই দাবীও কেউ উত্থাপন করবে না। শহীদ দিবসের সাহিত্যমূলক উদ্যোগের তাৎপর্য এবং সার্থকতা ভিন্ন স্থানে নিহিত।

প্রথমতঃ, ১৯৫২ সালের সকল ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার আপামর মানুষের জীবনে যে দীপ্ত আত্ম-সচেতনতা এনে দিয়েছে; তার সাংস্কৃতিক চিন্তায় যে নতুন বোধের জন্ম দিয়েছে, তার আশা আকাঙ্খায় যে বলিষ্ঠতার রঙ পরিয়েছে, একুশের সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ড প্রতিবছরই নতুন করে তার উদ্বোধন ঘটাচ্ছে। ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার ইতিহাসে একটি পরম উজ্জল অধ্যায়। স্বাধীনতার ঠিক পরে পরেই যখন মানুষের মন অজস্র আশায় উন্মুখ, ধর্মীয় চেতনা যখন মানুষের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার বোধের চাইতেও প্রবলতর, ঠিক তখনি বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আদায়ের লড়াই একই সঙ্গে একাধিক রাজনৈতিক দ্বিধা সংশয়কে দূর করতে সক্ষম হয়েছিল। বিদেশী শাসকদের সঙ্গে পরাধীন জাতির প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটার সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের প্রারম্ভ অনিবার্য। ভাষা আন্দোলনের প্রধান তাৎপর্য এইখানে তা সেই প্রতিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার জন্যে আন্দোলন পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে নিজেদেরকে সকল প্রকার রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে যেমন সচেতন

করে তুলেছে তেমনি সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, কুসংস্কার মুক্ত মৃত্তিকাস্পর্শী ভাবনাকে করে সুপ্রতিষ্ঠিত। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকা স্বাভাবিক নিয়মেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যদিও সুদীর্ঘ তবুও ঢাকা কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের চর্চা নতুন ভাবে শুরু হয়েছে গোড়া থেকে। সাহিত্যে এই অঞ্চলের গণজীবনের প্রতিফলন যা স্বাধীনতা পূর্ব বাংলা সাহিত্যে প্রায় অনুপস্থিত, আজ গভীর, ব্যাপক ও প্রচুর হয়ে উঠতো না যদি না ভাষা আন্দোলন সাংস্কৃতিক অধিকারবোধ সম্পর্কে নতুন চেতনার জন্ম দিত।

দ্বিতীয় যে কারণে একুশের সাহিত্যগত উদ্যোগে বিশেষ তাৎপর্য মণ্ডিত তা হল, ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা ও ঐতিহ্য আমাদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে মাটির সঙ্গে সংলগ্ন করে দিয়েছে একান্ত নিবিড় ভাবে। আগেই বলেছি, ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলায় সাহিত্য চর্চার সম্ভাবনাকে আকাশস্পর্শী করে তুলেছে। সেই সঙ্গে সাহিত্যকে গ্রথিত করেছে এদেশের গণজীবনের সঙ্গে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রভাব বহনকারী সাহিত্যের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মানুষের প্রতি আনুগত্য তা বলিষ্ঠ ও বেগবান। ভাষা আন্দোলন আমাদের শিল্প সাহিত্যে সঞ্চার করেছিল জীবন নিষ্ঠা ও বাস্তবতাবোধ। এই আন্দোলনের মাঝ দিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে বহু শিল্পী ও সাহিত্যিক যেমন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তেমনি মানুষের সপক্ষে এতবড়ো আন্দোলনের প্রভাব তাদের কর্মকে আপ্লুত করে তুলেছিল জীবন রসে! কিন্তু, দুঃখের বিষয় গত কয়েক বৎসরের রাজনৈতিক অবসাদের গোলক ধাঁধায় সেই উজ্জ্বল ধারা বিলুপ্ত হবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে আমাদের শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে।

আমাদের সমাজ জীবনে অতিক্রত উচ্চবিত্ত সম্পন্ন শ্রেণীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী সাহিত্যিকগণ ও আশ্রয় খুঁজে নিতে শুরু করেছেন ড্রয়িং রুমের নিরাপদ ক্ষুদ্র পরিসরে। খেতাব, পুরস্কার আর সামাজিক প্রতিষ্ঠা শিল্পী সাহিত্যিকদের উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করেছে এমন সৃষ্টিতে যা বিশেষ ভাবেই উচ্চ শ্রেণীর একক ভোগ্য, যা বিদ্রোহে অথবা প্রতিবাদের ঝঙ্কারে শাসক শ্রেণীর ক্রোধ উদ্রেক করেনা। ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী দশককে যদি আমরা বলি জীবননিষ্ঠার যুগ তবে পরবর্তী দশক কে অভিহিত করতে হবে জীবন বিমুখতার কাল রূপে। গত কয়েক বছরে চিত্র শিল্পীরা ঝুঁকেছেন বিমূর্ত ধারার দিকে, কবিরা ব্যবস্থা আঙ্গিকে আর অবসাদ নিয়ে, গল্পকার আর উপন্যাসিক চৈতন্য প্রবাহের রূপোঘাটনের নামে সৃষ্টি করে তুলেছেন অর্থহীন কথার কোলাহলে গত কয়েক বৎসরের সামাজিক রূপান্তরের ধারা, তাদেরকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে কলা কৈবল বাদের মারাত্মক গণ্ডীতে আবদ্ধ হতে। গত এক দশকে আমাদের ক'জন শিল্পী সাধারণ মানুষের জীবন অবলম্বন করে ছবি এঁকেছেন। ক'জন কবির সৃষ্টিতে ভাষা পেয়েছে নিপীড়িত মানুষের বেদনা? ক'টা উপন্যাস লেখা হয়েছে কৃষক, শ্রমিক আর সাধারণ মানুষের জীবনকে অবলম্বন করে?

একুশে ফেব্রুয়ারীর মহিমা এই খানে যে প্রতিবছর আত্মত্যাগী কয়েক জনের স্মৃতি আমাদের ডাক দেয় মানুষের সপক্ষে দাঁড়াতে; সকল সুবিধা বাদ আর পশ্চাৎমুখী চিন্তা ঝেড়ে ফেলে সংগ্রামের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হতে। ভাষার আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা আমাদের সৃষ্টিশীল উত্তমের দিক-প্রদর্শক।

একুশের শপথ

রাশেদ খান মেনন

মহান একুশ। ক্ষমতায় আসীন শোষক চক্রের নবলব্ধ স্বাধীনতার কুট মোহজাল ছিন্ন করে পূর্ব বাংলার মানুষের স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামের গণ-শক্তির প্রথম উৎসারণ।

একুশে যে সংগ্রামী চেতনা ছাড়িয়ে দিয়েছিল তাতে উদ্দীপ্ত দেশবাসী গণ-অধিকার কায়েমের জন্য একের পর এক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ঐতিহাসিক ১১—দফার সংগ্রাম সেই আন্দোলনের নব-পর্যায়। কর্মসূচীর বাস্তবতায়, অংশ গ্রহণের ব্যাপকতায় গণ শক্তি বিপ্লবী প্রচণ্ডতায় এই আন্দোলন নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু জনতার অধিকার আদায়ের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এক দিকে সংকারের চরম নির্যাতন অন্য দিকে দক্ষিণ পন্থী সুবিধাবাদ ও সংশোধন বাদী আপোষ কামীতা আন্দোলনকে স্তব্ধ, বিভ্রান্ত ও বিপথে পরিচালিত করার প্রচেষ্টায় রত।

নতুন একুশে আমাদের তাই শপথ হোক শহীদ সালাম—বরকত ও শহীদ আসাদের রক্তের পবিত্র আমানত গণ—আন্দোলনকে আমরা ব্যর্থ হতে দেব না। আপোষকামীতা ও সুবিধাবাদকে ধ্বংস করে এদেশের ছাত্র শ্রমিক মেহনতী মানুষের দাবীকে সামন্তবাদ বৃহৎ পুঁজি ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব মুক্তমুখী পূর্ব বাংলা কায়েম করব।

শিরীণ আখতার

প্রেরণার উৎসভূমি ও একুশের সংকলন

বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন আজ এক গৌরবের উপাখ্যান। আমাদের জাতীয় জীবনে প্রতিবাদী আন্দোলনের একটি বড় মাইলফলক। এ আন্দোলন বাঙালি জাতিকে দিয়েছিল নতুন পথের সন্ধান। জাতির প্রত্যয় নির্মাণে এবং নতুন অধ্যায় রচনায় অনন্য ভূমিকা পালন করেছিল। রাষ্ট্রের ভাষিক চেতনা ও জাতীয়তাবোধের সমন্বিত পথচলার মুখ্য প্রেরণা হিসেবে সব সময়ের জন্য নিরন্তর উৎস হয়ে আছে একুশ তথা ভাষা সংগ্রাম। বলা যায়, জাতির সামগ্রিক চেতনায় ভাষা আন্দোলনের প্রভাব কেবল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই পড়েনি, একুশের মহিমা বাংলা সাহিত্যেও বারবার উচ্চকিত হয়ে আসছে প্রবলভাবে। কেননা সমগ্র পৃথিবীতে ভাষার জন্য কোনো জনগোষ্ঠীর আত্মত্যাগের এমন উদাহরণ সত্যিই বিরল। এর প্রেরণা নিজস্ব সংস্কৃতি লালন ও বিকাশের প্রেরণা। এর প্রেরণা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রেরণা।

অমর একুশের রক্তাক্ত স্রোতধারা বাঙালির কৃষ্টি ও সভ্যতায় সতত প্রবহমান। জাতির সেই প্রেরণার প্রবহমান পথ ধরেই প্রতিবছর একুশ আসে। একুশ জাতির শিল্প মননে জাগিয়েছিল ঐতিহাসিক প্রেরণা যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ একুশের চেতনাবাহী বইমেলা। এখন বাঙালির সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব। বাঙালির এই নান্দনিক সাংস্কৃতিক উৎসবের প্রধান শক্তি ভাষা সংগ্রাম। ভাষা নিয়ে আমাদের আবেগ প্রবল। মননের প্রতীক বইমেলায় প্রতিবছর একুশ নিয়ে শত শত বই ও সংকলন বের হয়েছে। আর একুশ কেন্দ্রিক এই সংকলন ও প্রকাশনাগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতি বছর লেখা হয় অসংখ্য কবিতা, গান, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক। একুশ তথা ভাষাকেন্দ্রিক যত সংকলন প্রকাশিত হয়েছে তার প্রধান প্রেরণা ছিল হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশের প্রথম সংকলন। এখনও এই সংকলনকে ছাড়িয়ে যাবার মতো প্রকাশনা বিরল। পরবর্তীতে বাংলা একাডেমি একুশ কেন্দ্রিক প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করেছিল এগুলোও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে গত কয়েক বছর আগে অ্যাডর্ন পাবলিকেশন একুশ উপলক্ষে বড় একটি সংকলন প্রকাশ করেছিল। একুশ কেন্দ্রিক এই ধারাবাহিক প্রকাশনার সকল প্রেরণা ছিল ১৯৫৩ সালে প্রথম সংকলনটি। কাজেই একুশের প্রথম সংকলন প্রকাশ ছিল এ দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। সেই সময় পাকিস্তানের দুঃশাসন, সাম্প্রদায়িকতা; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র যখন চলমান, ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজনীতির ক্ষেত্রে যে সচেতনতা সৃষ্টি হয় তা ধরে রাখার প্রবল ইচ্ছার অনন্য সৃষ্টি 'একুশের সংকলন'। নিজের জীবন বাজি রেখে তখন এ রকম একটি প্রতিবাদী, সত্যিকারের সৃষ্টিশীল সংকলন প্রকাশ করা বিস্ময়ের ব্যাপার। সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে একুশের চেতনা তথা একটি ভূখণ্ডের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক প্রাণশক্তি ও প্রণোদনাকে লালন ও ধারণ করার জন্য ওই সংকলনের কোনো বিকল্প ছিল না। সংকলনটি প্রকাশ করতে গিয়ে হাসান হাফিজুর রহমানকে অপরিসীম ত্যাগ করেছে বলে আজ এটি একটি

সংগ্রামের পতাকা সবচেয়ে দীর্ঘ সময় বহন করেছেন হাসান হাফিজুর রহমান। একুশে সংকলন নিয়ে যারা সেদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন, শ্রম দিয়েছিলেন, তারাই পরবর্তীতে দেশের শীর্ষস্থানীয় সাহিত্য প্রতিভা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

একুশের প্রথম সংকলন নিয়ে বহু লেখালেখি হয়েছে। দেশের প্রতিভূ লেখকরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে গেছেন। তাই নতুন করে বলার হয়তো কিছু নেই। একুশের তাজা আবেগকে কেন্দ্র করে এমন একটি ধ্রুপদী কাজ বাঙলা সাহিত্যে দ্বিতীয়টি নেই। ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমান প্রথম একুশে সংকলন সম্পাদনা করতে গিয়ে তিনি নিজেই লিখেছেন 'একটি মহৎ দিন হঠাৎ কখনো জাতির জীবনে আসে যুগান্তরের সম্ভাবনা নিয়ে। পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে একুশে ফেব্রুয়ারি এমনি এক যুগান্তকারী দিন। শুধু পাক ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে নয়, একুশে ফেব্রুয়ারি সারা দুনিয়ার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। দুনিয়ার মানুষ হতচকিত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছে মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনতার দুর্জয় প্রতিরোধের শক্তিতে, শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছে ভাষার দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানের তরুদের এই বিশ্ব ঐতিহাসিক আত্মত্যাগে। জাতিগত অত্যাচারের বিরুদ্ধে, জনতার গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্যে দুনিয়াজোড়া মানুষের যুগ যুগব্যাপী যে সংগ্রাম, একুশে ফেব্রুয়ারি তাকে এক নতুন চেতনায় উন্নীত করেছে।'

এই সংকলনের প্রতিটি গল্প, কবিতা, গান, প্রবন্ধ শুধুই একুশকে উপলক্ষ করে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটির পূর্ণাঙ্গ চিত্র, তার আবেগময়তা, তার ত্যাগের মহিমান্বিত চিত্র সত্যি মুগ্ধ করার মতো। অধ্যাপক রফিক উল্লাহ খান মূল্যায়ন করেন এভাবে-'ভাষা আন্দোলনের শিক্ষিত আবেগপুঞ্জকে সংরক্ষিত করার এই কর্মোদ্যোগ, নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ হাসান হাফিজুর রহমানের জীবনচেতনার এক গৌরবোজ্জ্বল প্রান্ত। জাতীয় ইতিহাসের এক মহত্তম অধ্যায়ের রক্তাক্ত অনুভূতিপুঞ্জকে গ্রন্থবদ্ধ করে বাঙালি জাতির জীবন ও শিল্প পটভূমিতে তিনি মর্যাদার স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।'

আমরা সকলেই জানি, একুশের রক্তাক্ত ঘটনাকে অবলম্বন করে যা কিছু রচিত হয়েছে, তার মধ্যে আবদুল গাফফার চৌধুরীর গান, মাহবুব-উল-আলম চৌধুরীর কবিতা এবং শহীদ মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটক মানুষের হৃদয়ে সবচেয়ে বেশি স্থান করে নিয়েছে। ওই সংকলনভুক্ত শামসুর রাহমান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আব্দুল গনি হাজারী, ফজলে লোহানী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আনিস চৌধুরী, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, জামাল উদ্দিন, আতাউর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক ও হাসান হাফিজুর রহমান সকলের কবিতাগুলোও অসাধারণ। কবিতাগুলোতে শুধু আবেগ নয়, তাৎক্ষণিক ক্ষোভের জ্বালাময়ী চিত্র ফুটে ওঠেছে। বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত বিদ্রোহের প্রবল প্রলয় মূর্ত হয়েছে কবিতাগুলোতে। গল্প লিখেছেন- শওকত ওসমান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, আনিসুজ্জামান, সিরাজুল ইসলাম ও আতোয়ার রহমান। প্রতিটি গল্পই একুশের হৃদয়জাত, ভাষার আবেগে উদ্বেলিত।

সংকলনের শুরুতেই রয়েছে সকল ভাষার সমান মর্যাদা শিরোনামে আলী আশরাফের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ। একটি বেওয়ারিশ ডায়েরীর কয়েকটি পাতা- শিরোনামে 'নকশা' লিখেছেন শিল্পী মূর্তজা বশীর। সালেহ আহমদ লিখেছেন 'অমর একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত স্বাক্ষর' নামে একটি অন্যরকম লেখা। প্রতিটি প্রবন্ধ, নকশায়

একুশের শহীদেরা, যে অমর দেশবাসীর মধ্যে অটুট হয়ে রয়েছে একুশের প্রতিজ্ঞা তাদের উদ্দেশ্যে।' একুশের ঘটনাপঞ্জি নামে পরিশিষ্টে যুক্ত হয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারির আগে ও পরে উত্তাল দিনগুলোর বর্ণনা। ক্ষুদ্র এই রচনায় একুশে ফেব্রুয়ারির জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে। আব্দুল মান্নান সৈয়দ বলেন, 'সুসম্পাদিত সংগ্রহ, অবিশ্বাস্য মনে হয় আজ। হাসান হাফিজুর রহমানের বয়স তখন মাত্রই কুড়ি। সহযোগিতা ছিল নিশ্চয় অন্যদের কিন্তু তারাও সবাই অতি তরুণ। তারুণ্যের যে অগ্নি সেদিন প্রজ্বলিত করেছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান আর তার সাথীরা, আজও তা অনির্বাণ, অনির্বাণ থাকবে চিরকাল'। সংকলনটির গুরুত্ব প্রসঙ্গে সৈয়দ শামসুল হক বলেন, 'শুধু ঐতিহাসিক তাৎপর্যের কারণেই নয়, লেখার বৈচিত্র্য ও মানের বিচারেও একুশের প্রথম সংকলনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট প্রকাশনা। সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমানের কর্মস্পৃহা, নিষ্ঠা ও ত্যাগের কথা জাতি স্মরণ রাখবে সুনিশ্চিতভাবে।'

কোনো কোনো আত্মত্যাগ আদর্শগত কারণে সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বহন করে। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জীবনে তেমনই এক অসীম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যা অনুপ্রেরণার অমোঘ সঞ্চারী হিসেবে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অনির্বাণ শিখার মতো চির প্রজ্জ্বলমান আছে। একুশ কেন্দ্রিক যা কিছু আজ প্রকাশিত, প্রসারিত, প্রস্ফুটিত হচ্ছে তার পেছনে রয়েছে এসব সংকলনগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অসামান্য অবদান। তাছাড়া আমাদের রাজনীতিতে এর গভীর প্রভাব, বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের ধারায় লড়াইয়ের মাধ্যমে ভাষিক জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ গঠনের ক্ষেত্রে একুশের ধারাবাহিক প্রভাব। আমাদের জাতির বিবেককে নাড়া দেয়ার মতো আলোড়ন সৃষ্টিকারী একুশ, তার প্রভাব সমকালীন সাহিত্যে ও রাজনীতিতে পড়বে এটাই অবধারিতভাবে সত্য। ফলে একুশ ও একুশের সংকলন রাজনীতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে অধিক গুরুত্ববহ।

পরিশেষ বলতে পারি, একুশের পর বাঙালি যে নবজন্ম লাভ করে, তাতে চেতনায় ও সৃজনশীলতায় নতুন এক দিগন্তের সাক্ষাৎ পায় বাঙালি। তাকে ঘিরে সংকলনটি ছিল এই ভূখণ্ডের মানুষের সার্বিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রথম প্রতীক। এটি এখন জাতীয় সম্পদ। বাঙালির মননচর্চার ভিত্তিভূমি। এর মাঝেই রয়েছে আমাদের জাতিসত্তার পরিচয়, লিপিবদ্ধ হয়েছে ইতিহাসের গৌরবগাথা।

গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া

একুশের সংকলনে জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা

(চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরে রক্ষিত কয়েকটি সংকলন অবলম্বনে)

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মর্যাদা দেবার দাবীতে যেভাবে ছাত্র-জনতা ঢাকা শহরের রাজপথে নেমে এসেছিল তা ছিল অভূতপূর্ব এবং প্রত্যাশিত একটি প্রতিবাদ। সেদিন যাঁরা মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁরা বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্যই প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ এই পাঁচ বছরে তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় প্রশাসন বুঝতে পেরেছিল যে, বাঙালিদের যেভাবেই হোক দাবিয়ে রাখতে হবে। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষা ছিল বাংলা। তা সত্ত্বেও উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা তৎকালীন পাকিস্তান সরকার করেছিল। বাঙালীরা সালাম, বরকত, জব্বারদের রক্তের বিনিময়ে বাংলা ভাষার কাঙ্ক্ষিত মর্যাদা পাবার লড়াইয়ে ক্রমে এগিয়ে যায়। বাঙালীরা নানা পদক্ষেপ নিতে থাকে।

১৯৫২ সালের পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমান 'একুশে ফেব্রুয়ারী' নামের একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। মূলত এটিকে অনুসরণ করে পরে সারা পূর্ববাংলার শহরগুলোর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলো প্রতিবছর একুশে সংকলন প্রকাশ করতে থাকে। এক সময় ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এ উদ্যোগটি যেন একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে পরিণত হয়। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এসব সংকলনে প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা প্রকাশ করার মাধ্যমে ভাষা-শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রকাশ করেছে।

বর্তমান নিবন্ধে একুশে সংকলনের লেখাগুলো থেকে কিছু নির্বাচিত প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতাকে এখানে উপজীব্য করা হয়েছে। এগুলো থেকে সে সময়ের তরুণদের মন-মানসিকতা ও রুচি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

আলোচিত সংকলনগুলোর মধ্যে রয়েছে হারুন অর রশিদ সম্পাদিত ঝড়ের পাখির গান (তারিখ বিহীন), শওকত হাফিজ খান (রুশ্দি) সম্পাদিত সূর্য সড়ক (১৯৬৭), সৈয়দ শামসুল হুদা সাইদ সম্পাদিত কৃষ্ণচূড়া (১৯৭০), রফিকুজ্জামান সম্পাদিত বসন্তের সুরে পূরবীর ঐকতান (১৯৭০), মো. ছাফাতুল্লাহ (টুনু) সম্পাদিত সূর্য শপথ (তারিখ বিহীন), বালার্ক, সংস্কৃতি সংসদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত। শফিকুল হাসান সম্পাদিত বিদ্রোহী (১৯৭৪), শ ম নজরুল ইসলাম সম্পাদিত উত্তপ্ত অনুভব (১৩৮১ বঙ্গাব্দ), সুশান্ত ঘোষাল সম্পাদিত রক্তিম স্বাক্ষর (১৩৭৬ বঙ্গাব্দ)। এগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের বিদ্রোহী, চট্টগ্রাম ছাত্রলীগের সূর্য সড়ক ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের বালার্ক প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া অনিকেত সাহিত্য সংসদের কৃষ্ণচূড়াও প্রকাশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য যে উল্লিখিত সংকলনগুলোর মতো বহু সংখ্যক একুশে সংকলন সে সময়ের শহরগুলো থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে যে চিন্তা-চেতনা প্রকাশ পেয়েছে সেগুলো বাঙালী জাতীয়তাবাদকে পুষ্ট করেছে এবং দিয়েছে সঞ্জীবনী শক্তি। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা হিসাবে এগুলো কাজ করেছে নিঃসন্দেহে।

'সূর্য শপথ' (তারিখ বিহীন) নামের সংকলনে বিশিষ্ট সাংবাদিক আহমেদ হুমায়ুন

করেছে তার কারণ হলো ভাষা আন্দোলন জাতি ধর্ম ও শ্রেণি নির্বিশেষে স্পর্শ করেছিল পূর্ববাংলার প্রতিটি মানুষকে। এমন ব্যাপক সর্বজনস্পর্শী আন্দোলন এদেশে এর আগে কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি' (পৃ.২৮)। লেখক ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ও প্রভাব প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন এভাবে- ... 'ক্লান্তিহীন সংগ্রাম ভাষা আন্দোলনের অমোঘ শিক্ষা। এই শিক্ষা বিস্মৃত হওয়ার অবকাশ অদূর ভবিষ্যতেও নিহিত নয়। মৃত্যুদিন আরও বহুকাল জন্মদিন রূপে উদ্ভাসিত হতে থাকবে আমাদের জীবনে' (পৃ.২৯)। আহমেদ হুমায়ুন কৃষ্ণচূড়া (১৯৭০) নামের অপর একটি সংকলনে লিখেছেন ' ভাষা আন্দোলন ও সাহিত্য চিন্তা' নামের একটি প্রবন্ধ। তাঁর এই প্রবন্ধে একুশে সংকলনের গুরুত্ব ও প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি লিখেছেন ' শহীদ দিবসকে উপলক্ষ করে প্রতিবছরই অগুনতি সাহিত্য সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে ঢাকা এবং অন্যান্য শহর থেকে। যতই বছর পেরোচ্ছে এ ধরনের সংকলনের সংখ্যা ক্রমেই স্ফীত হচ্ছে। ছাত্র সমাজই প্রধানত শহীদ স্মারক পত্রিকাগুলোর প্রকাশক। প্রতিষ্ঠিত এবং নবীন কবি-সাহিত্যিক উভয়ের রচনায় সংকলনগুলো সমৃদ্ধ হয়ে থাকে (কৃষ্ণচূড়া)। এ সব সংকলনগুলোর সাহিত্যমূল্য বিচার করে লেখক মন্তব্য করেছেন 'সাহিত্যের সাধারণ নিয়ম ও সংজ্ঞা একুশের সাহিত্য সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু শহীদ দিবসের সাহিত্যমূলক উদ্যোগের তাৎপর্য এবং সার্থকতা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্থানে নিহিত (ঐ)।

বালার্ক নামের সংকলনটি পূর্বপাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, চট্টগ্রাম শাখা থেকে প্রকাশিত। এটির উদ্যোক্তা ছিল সংস্কৃতি সংসদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। এই সংকলনে 'চিহ্নিত শত্রু ও সংগ্রামী ঐক্য' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন পূর্ণেন্দু দস্তিদার। এই লেখায় পূর্ববাংলায় সংঘটিত নানা বিদ্রোহাত্মক ঘটনার মূল্যায়ন করেছেন। 'লাঙল যার জমি তার' শ্লোগানের বশবর্তী হয়ে বেশকিছু কৃষকবিদ্রোহের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। 'তেভাগা', 'নানকার', 'টংক', ইত্যাদি বিদ্রোহ ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে ছাত্রসমাজ যেভাবে সমর্থন যুগিয়েছে তা তিনি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন। কৃষকদের মত শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নগুলোও উপমহাদেশে নিজেদের অধিকার আদায়ে বহু আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। অবিভক্ত ভারতের বোম্বাই, আহমেদাবাদ, কানপুর, কলিকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম ইত্যাদি শহরে শ্রমিকেরা আন্দোলন করেছে, ধর্মঘট করেছে। ছাত্ররাও স্বাধীনতার দাবী ওমজুর-চাষীদের সমর্থনে মিছিল, বিক্ষোভ, ধর্মঘট করেছে। ১৯২২ সালে চট্টগ্রামে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘটের সমর্থনে চট্টগ্রাম কলেজ ও স্কুলের ছাত্ররা ধর্মঘট করেছিল এবং ধর্মঘটি শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। পূর্ণেন্দু দস্তিদার লিখেছেন 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচারী আইউব শাহীর ধ্বংশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঐক্যবদ্ধ দাবী " ১১ দফা ভিত্তিতে ১৯৬৯-৭০ এর অভূতপূর্ব গনঅভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছে। . . . ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ছাত্রসমাজকেও হতে হবে অকুতোভয় সহযাত্রী। প্রকৃত শত্রুকে চিহ্নিত করা ও তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম শহীদ দিবসের এই শপথ"(বালার্ক)।

মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে প্রকাশিত একুশে সংকলনগুলোতে স্থান পাওয়া নানা লেখাগুলোর উপজীব্য ছিল পূর্ববাংলার আর্থ- সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের নানা প্রসঙ্গ। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে বাঙালীদের যে ঐক্যবদ্ধ শক্তি সৃষ্টি হয়েছিল তাই মুক্তিযুদ্ধের সফলতাকে নিশ্চিত করেছিল। তাই একুশের সংকলনগুলো আমাদের জাতীয় ইতিহাসের উপাদান হিসেবে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর

অজিত কুমার গুহ

উনিশ শ' বায়ান্ন সালের কথা। ছাত্রেরা ১৭ই ফেব্রুয়ারী 'পতাকা দিবস, উদ্‌যাপন কোরবে। সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম কমিটি এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সমস্ত প্রদেশে প্রদেশে প্রাণচাঞ্চল্য উদ্বেল হয়ে উঠেছে। পথে পথে ছাত্রেরা পতাকা বিক্রী কোরছে। চাদর বা কাপড় পেতে টাকা পয়সা সংগ্রহ কোরছে। কতবার যে ওদের টাকা পয়সা দিয়েছি তার ঠিক নেই। বেলা তখন প্রায় এগারোটা হবে। ওয়ারী এলাকায় আমার বাসা থেকে বেরিয়ে কিছু দূর যাওয়ার পরেই একদল ছাত্র এসে রিক্সা থামালে। আমাকে কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই চাঁদার জন্যে হাত বাড়ালো। হেসে বল্লেম, কতবার দিতে হবে তা' জানিয়ে দাও. কতবার কত দলকে দিতে পারি আমি তা'ও তোমরা বিবেচনা কোরো, একটি ছেলে এগিয়ে এসে বল্লে "স্যার আপনি অনেকবার দিয়েছেন তার তো চিহ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছিনে আপনার কাছে। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল পতাকাগুলো পকেটেই রেখে দিয়েছি। পকেট থেকে অনেক গুলো পতাকা একসঙ্গে বার করে ছেলেটিকে দেখালোম। ওনিরাশ হয়ে গেল। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মায়া হলো। ওকে ডেকে কিছু চাঁদা দিলেম। বড়ো বড়ো দু'টো চোখ তুলে গভীর কৃতজ্ঞতাভরে ও আমার দিকে তাকালো। তারপর কর্মস্থলে চলে গেলাম এরপর থেকে একুশে তারিখ পর্যন্ত নানা-

রূপ প্রস্তুতি চলেছে, একুশে তারিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম সমিতি রসভা। সে সভারবিবরণ সকলেরই জানা আছে। বরকত, সালাম প্রভৃতি শহীদ হলো। অনেক ছাত্র আহত হল। ২২ শে ফেব্রুয়ারী শোভাযাত্রার উপর আবার গুলি চল্লো। সমস্ত দেশ জ্বলে উঠ্‌লো।

২৩শে তারিখ। যুদ্ধের সাজে সজ্জিত সৈনিকদের গাড়ীগুলো প্রধান প্রধান রাজপথগুলো ঘিরে রেখেছে। পথচলার উপায় নেই। কিন্তু এর মধ্যেই পাথরের বাধা না মেনে জনস্রোত যেমন আরো বেগে বয়ে যায় ঠিক তেমনি জনতার স্রোত চলেছে। চলছে মেডিকেল কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। কয়েকজন তরুণ অধ্যাপক সঙ্গে নিয়ে হাতের ঝোলায় কিছু ফল নিয়ে আহতদের দেখবার জন্যে মেডিকেল কলেজের দিকে রওনা হলেম। অপরাহ্ন বেলা, মেডিকেল কলেজে গিয়ে ঘুরে ঘুরে আহতদের দেখছি। পরিচিত কয়েকজন আহত হয়েছে দেখতে পেলাম। সকলের কাছে গিয়ে কিছু কিছু ফল পাশের টেবিল রেখে চলে এসেছি। দরজার ধারে একটি বিছানার পাশে কয়েকটি তরুণ ছাত্র দাঁড়িয়েছিল, বিছানায় আহত ছাত্র। সামনে গিয়েই চমকে উঠ্‌লেম, এইতো সেই ছেলে যে সেদিন আমার কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে গিয়েছিল। এগিয়ে গেলাম। কিছু ফল পাশের টেবিলটায় রেখে ওর গৌরবর্ণ প্রশস্ত ললাটে হাত বুলোতে লাগলাম। গুলীটা ওর কাঁধ ভেদ করে চলে গিয়েছে। বহু রক্তক্ষরণ হওয়াতে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। একজন ডাক্তার এলেন। আমাকে দেখে আদাব দিলেন, বল্লেন, কথা বলার চেষ্টা কোরবেন না কিন্তু। কথা বল্লে ও উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে, তাতে ওর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি পাশে বসে ওর মাথার চুলে হাত বুলোচ্ছি। একবার আয়ত দুটি চোখ মেলে আমার দিকে তাকালো। পাশের ছাত্রেরাও

চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। ভাবছি তরুণ অধ্যাপকদের সঙ্গে নিয়ে চলে আসবো এমন সময় হঠাৎ তীব্র স্বরে চীৎকার করে উঠলো। আরো অনেক রক্ত দিতে হবে স্যার। অনেক রক্ত দিতে হবে, আরো অনেক ষড়যন্ত্র পেরিয়ে যেতে হবে। সব নষ্ট হয়ে যাবে। উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তৎক্ষণাৎ ধরে ওকে শুইয়ে দিলেম, বল্লেম চুপ কর ভালো হয়ে পরে এসব কথা বলতে পারবে, কিন্তু এখন তুমি কথা বলতে পারবে না। কাছেই যে ছাত্রেরা দাঁড়িয়ে ছিল ওরা আমাকে বল্লে, আপনি থাকলে স্যার ও কথা বলার চেষ্টা করবে।

নীরবে অশ্রুসিক্ত নয়নে ওর কাছ থেকে চলে এসেছি।

এ সব অনেকদিন আগের কথা। প্রায় বিশ বছর হতে চলেছে ছোট ছোট অনেক ঘটনাই ভুলে গিয়েছিলেম।

ভাষা-আন্দোলন এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে উৎস খুলে দিয়েছিল ইতিহাসের নানা বিপর্যয়ে তার ধারা অনেকখানি স্তিমিত হয়ে এসেছে। বাংলাভাষাও জীবনের সর্বস্তরে শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্রে তার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তার বিকাশ পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু ইতিহাস তো মসৃণ পথে চলে না, বিসর্পিল তারগতি।

হঠাৎ সেদিন দেখি প্রলয়-বন্যার উদ্দাম চঞ্চল বন্যা আবার দেশকে প্লাবিত করে দিয়েছে। তরুণ ছাত্রেরা আবার এগিয়ে এসেছে। সে দিন শহীদ আসাদুজ্জামানের জানাজার দৃশ্য দেখছি। জনসমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ যেন আমি একটি বলিষ্ঠ তীব্র কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। প্রায় বিশ বছরের ব্যবধান পেরিয়ে আমার কানে স্পষ্ট বাজতে লাগলো— "আরো অনেক রক্ত দিতে হবে স্যার, অনেক রক্ত দিতে হবে। আরো অনেক ষড়যন্ত্র পেরিয়ে যেতে হবে।" অনেকদিন আগের হাসপাতালের সেই আহত ছাত্রটির আর্তনাদ।

আজো মনে পড়ে

আবদুল্লাহ্ আল-মুতী

আজো স্পষ্ট মনে পড়ে সেদিনের কথা। জীবনের পাতায় অতি তীব্র লাল অক্ষরে লেখা একটি দিন।

আমাদের ইতিহাসে বোধ করি সব চাইতে উজ্জ্বল, সব চাইতে তাৎপর্যময় সেই দিনটি। দুরন্ত যৌবনের দুর্বার সাহসে উজ্জীবিত, রাশি রাশি পলাশের রক্ত রঙে রাঙানো, বাংলার মাটিতে নতুন সম্ভাবনার আলো ছড়ানো পরম পবিত্র এক ৮ই ফাল্গুন।

আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কার্জন হলের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে বিজ্ঞানের জটিল রহস্য উন্মোচনে শিক্ষকদের অকৃপণ সহায়তায় পুষ্ট ধন্য বিমুগ্ধ এক জ্ঞানার্থী।

কিন্তু ভাষার সাথে বিজ্ঞানের কি কোন বিরোধ আছে? ভাষার পঙ্গুতায় দেশ আর মানুষ, আর মানুষের আত্মা যেমন পঙ্গু, তেমনি পঙ্গু বিজ্ঞানও। দেশের আপামর মানুষের আত্মবিকাশের সাথে গায়ে গায়ে মিশে আছে বিজ্ঞানের বিকাশ। মানুষের মুখের ভাষা যদি স্তব্ধ হয়ে যায় তাহলে কি করে কাজে লাগাবে তারা বিজ্ঞানের অপরিমেয় ঐশ্বর্যকে?

তাই কার্জন হলের স্বভাবতঃ শান্ত পরিবেশও সেদিন বিক্ষুব্ধ হয়েছিল ভাষার অধিকারের দাবীতে। গবেষণাগারে পরীক্ষার যন্ত্রপাতি ছেড়ে বিজ্ঞানের জ্ঞানার্থীরাও পা বাড়িয়েছিল হাজারো মানুষের সংগ্রামী কাতারে। দুর্জয় সাহসে তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল উপনিবেশবাদীদের বাংলা-বিরোধী চক্রান্তকে, বুক পেতে দিয়েছিল প্রতিক্রিয়ার হিংস্র নখরের সামনে।

এর আগেও বেরিয়েছে অনেক। স্বাধীনতার সত্যিকার স্বাদ পাবার তাগিদে, মানুষের মতো বাঁচবার, নতুন সুখী সমাজ গড়বার তাগিদে সে-সব মিছিলের জন্ম। মিছিলে শরিক হয়েছি আমরা অনেক ছোট ছোট দলে। অন্যায় আর অত্যাচারের প্রতিবাদ করার 'অপরাধে' আমার মতো বহু শিক্ষার্থী

বন্দী হয়েছে কারাগারে। কারা প্রাচীরের আড়ালে অমানুষিক ব্যবহারের প্রতিবাদে আটান্ন দিন ব্যাপী অনশনের কালে আমরা ভেবেছি, সারা দেশ কি আমাদের সাথে আছে? ভাষার দাবীতে, বাঁচার দাবীতে দেশজোড়া মানুষ কি চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্যে এক হতে পারবে? আমাদের বুকের ভাষাকে কি আমরা সত্যি সত্যি বাঁচাতে পারব প্রতিক্রিয়ার বিষাক্ত ছোবলের হাত থেকে?

এই একটি দিনের মিছিল হল আর সব মিছিলের থেকে আলাদা। প্রতিক্রিয়ার বর্বর আঘাত তরুণ কিশোরের রক্ত ঝরিয়ে, বাংলার বেহদতি মানুষের রক্ত ঝরিয়ে প্রমাণ করল ভাষার দাবী কত জোরালো। প্রমাণ করল, রাষ্ট্রের সকল শক্তির অধিকারী হয়েও প্রতিক্রিয়ার ভিত আসলে কত দুর্বল।

মিছিলের লক্ষ লক্ষ মানুষ যেন সেদিন আমাদের চোখে আঙুল দেখিয়ে বলল: আমরা আছি সব এক সাথে। আমরা থাকব কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। আমরা করব আমাদের ভাষার বিরুদ্ধে সব হামলাকে। আমাদের অধিকারের বিরুদ্ধে সব চক্রান্তকে।

সেদিন ঘৃণা আর শপথের আগুন ঝরানো মিছিলের পথে পায়ে পায়ে চলতে গিয়ে বার বার মনে হয়েছে: শহীদের আত্মা অমর—দেশের জন্য যারা প্রাণ দেয় তাদের মৃত্যু নেই। তেমনি মৃত্যু নেই বাংলার মানুষের। আর মৃত্যু নেই বাংলা ভাষার।

সেদিন যেমন করে ঐক্য গড়ে উঠেছিল প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে বাংলার আপামর মানুষের, যেমন করে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বাংলার বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা ঔপনিবেশিক শক্তির চরিত্র, এমন আর কখনো হয়নি।

তারপর অনেক দিন গড়িয়েছে। দিনে দিনে ছোট ছোট মিছিল জড়ো হয়ে সৃষ্টি করেছে বিশাল মিছিলের কলরোল। এই সব মিছিলের উত্তাল প্রবাহ পরিণত হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্লুচণ্ড ঝঞ্ঝা আর বিস্ফোরণে। আর তাতে চুরমার হয়েছে ঔপনিবেশবাদের কলুষিত ইমারত। এই প্লুচণ্ড ঝঞ্ঝা আর প্লুলয়ের শেষে আজ উঠেছে স্বাধীনতার পবিত্র নতুন সূর্য।

যে রক্ত রাঙা দিনটিতে এই স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য তাকে কি কেউ ভুলতে পারে?

আবুল আব্বাস

মধুদার সাথে কিছুক্ষণ

আলাপ হচ্ছিল মধুদার সাথে। শীতের পড়ন্ত বিকেলে মধুর ক্যান্টিনের বারান্দায় আছড়ে পড়া মিষ্টি রোদে পাছড়িয়ে আলাপ করছিলাম একালের ছাত্র রাজনীতির সাথে উচ্চারিত সেই প্রিয় কিংবদন্তীর নায়ক মধুদা ওরফে শ্রী মধুসূদন দত্তর সাথে।

একুশে ফেব্রুয়ারী, ভাষা আন্দোলন, বিশ্ববিদ্যালয়, আমতলা, মিছিল, রাজপথ এ সব কয়টি বহু আলোচিত শব্দমালার পাশে সকলের হৃদয়ের একান্ত নিভৃতে যিনি গত বিশ বছরেরও উপর এদেশের ছাত্র সমাজের মধ্যমনি হয়ে আছেন তিনি মধুদা। মধুদার সাথে আলাপ করছিলাম সেই আঠারো বছর আগের যুগান্তকারী দিনটির কথা নিয়ে যার সাথে মধুদার নাম ওতপ্রোত জড়িত। মধুদা যা দেখেছেন, অনুভবের যাতনায় বিদ্ধ হয়েছেন আর ভেবেছেন আকুল হয়ে ভেবেছেন সেই লাল দিনটির কথা। মধুদাকে বললাম: বলুন না কিছু কথা। সেই দিনটি কেমন দেখলেন, কেমন করে কাটালেন ফেব্রুয়ারীর একুশ তারিখ? মধুদা আমার এই আকস্মিক অনুরোধে একটু হাসলেন। সেই নিত্য ঠোঁটে লেগে থাকা হাসি। বললেন: সেই সব দিনের কথাকি এখনো পুরো মনে আছে? সে কবে কার কথা! আমি আবার অনুরোধ করলাম মধুদাকে কিছু কথা বলুন যা আপনার আবছা মনে পড়ছে সেই দিনটির কথা! মধুদা দূরে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষন। তাঁর বহু ঘটনার অভিজ্ঞতায় তাকিয়ে থাকার স্বাভাবিকতা নিয়ে বহুদূরে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে ধূসর অতীতের দিকে ফিরে চাইলেন। একটু পরে হঠাৎ বললেন বরকত সাব তো আমার এখানেই চা খেয়ে গেছিলেন মিছিলে। পরে যখন বরকত সাবের লাশ দেখতে চাইছিলাম পারিনি। কতো পুলিশে ঘেরা ছিল। মধুদা কতো সৌভাগ্যবান! মধুদা বললেন: আমি কি মিছিল দেখেছি নাকি। আমি ক্যান্টিনে বসেছিলাম। শুনছিলাম শুধু শ্লোগানের আওয়াজ হৈ চৈ। কে একজন এসে আমাকে বলল গুলি হয়েছে। আমি ক্যান্টিনেই ছিলাম

তখন। পরে শুনলাম বরকত সাবই মারা গেছেন। এর পর যখন সালাম রফিক জব্বারের ছবি দেখি তখন মনে হলো আমার ক্যান্টিনে এদের কয়েকজনকে কতোবার দেখেছি চা খেতে। একুশ তারিখের পর বেশ কয়দিন আমার ক্যান্টিন বন্ধই ছিল। তখনতো চারদিকে লণ্ডভণ্ড কারবার।

আমার জানতে ইচ্ছে হলো সেদিন যারা সেই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন যাঁরা আমতলায় উত্তেজনাময় বক্তৃতা দিতেন তাঁদের কারো কথা মধুদার মনে পড়ে কিনা। মধুদা প্রায় অনেকের নামই মনে রাখতে পেরেছেন ওলী আহাদ আবদুল মতীন মোহাম্মদ তোহা গাজীউল হক অনেক নেতার নামই মধুদার মনে আছে। মধুদা বললেন এদের সাথে এখনো দেখা হলে আমাকে সুভাষন জানান।

মধুদা এখনও যখন পুরানো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যান শহীদ মীনারের সামনে দাঁড়ান তখন ধূসর স্মৃতি অমলিন কিছু কথা, মখ কিছু শব্দ বারবার ঝলঝল করে। বার্ধক্যের রেখার ছাপ পড়া মধু দার চেহারায় বেদনার রেখা ভেসে উঠে। মধুদা ভাবেন শুধু ভাবেন সেই দিনটির কথা। বরকতের কথা মধুদা কিছুতেই ভুলতে পারেন না। শান্তশিষ্ট চেহারার প্রত্যয়ে দৃঢ় বরকতের চেহারা যেন মধুদা এখনো খুঁজে ফেরেন মধুর ক্যান্টিনের জীর্ণ দেয়ালে।

(মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আবুল আব্বাস ছদ্মনামে লিখেছিলেন)

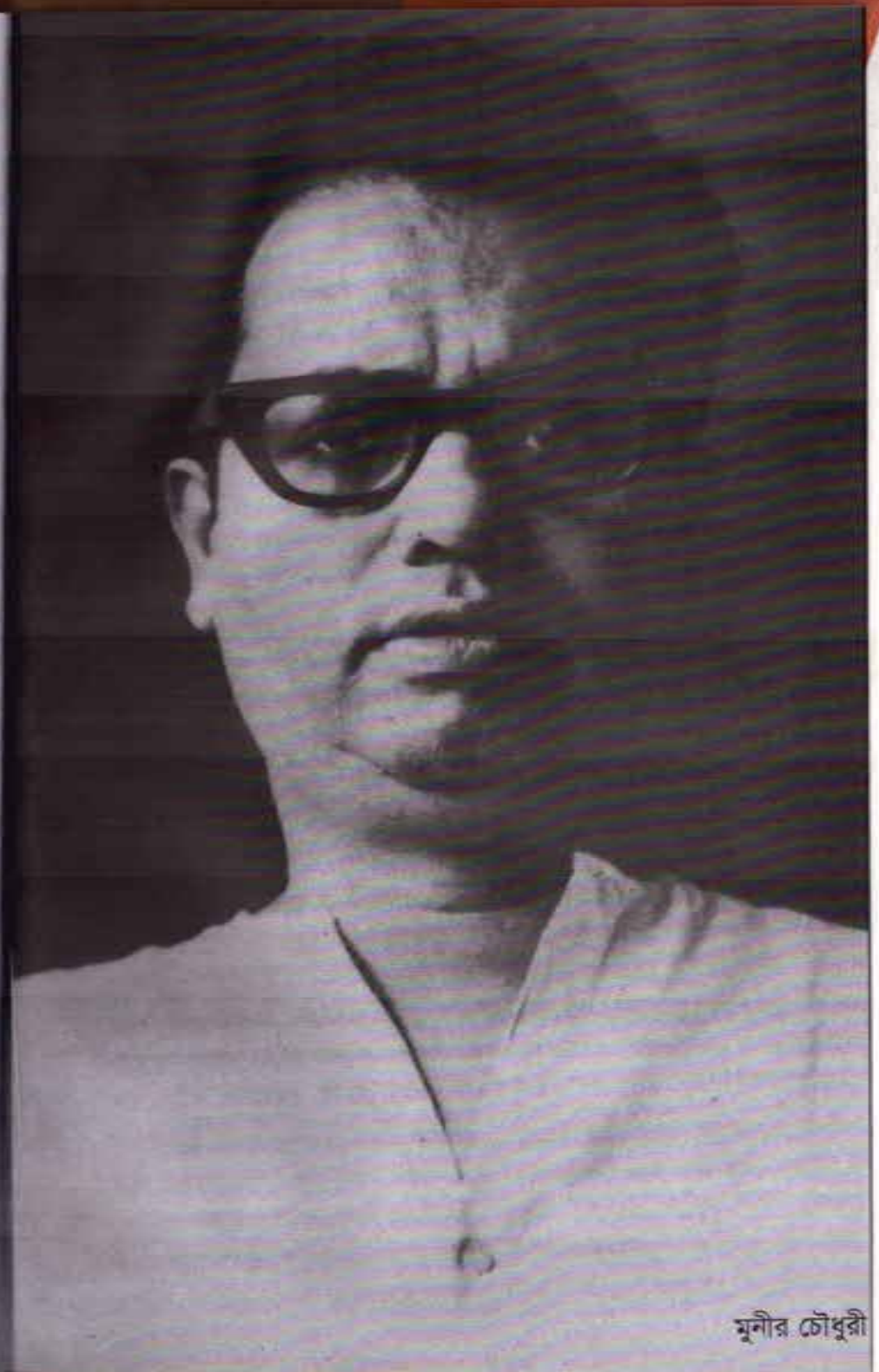

মুনীর চৌধুরী

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর

মুনীর চৌধুরীর সাক্ষাৎকার

দেশের সবখানে যেমন বাংলা ভাষা অবহেলিত তেমনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও বাংলা বিভাগ সবচে অবহেলিত বিভাগ। বাংলা বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ১৯৫৪ সালে ভাষা আন্দোলনে কারাভোগী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক প্রফেসর মুনীর চৌধুরী এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে এ মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে অবহেলিত বিভাগ হচ্ছে বাংলা বিভাগ। অন্যান্য বিভাগ যে সব সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে বাংলা বিভাগ তার প্রাপ্য অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বিভাগের ছাত্রের তুলনায় এখনও নয়জন শিক্ষকের অভাব রয়েছে।

বর্তমান পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলা ভাষার সার্বিক প্রসারে কি করণীয় হতে পারে এই সম্পর্কে তাঁর মত জানতে চাইলো অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী বলেন, আমি মনে করি বাংলা ভাষা প্রচলনের যে সমস্যা তা' বাংলা ভাষা উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত নয়। এটা প্রধানতঃ দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। তিনি বলেন, যারাই বাংলা ভাষার প্রসার ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছে তারাই আবার বাংলা ভাষার সর্বস্তরে প্রচলনের উৎকণ্ঠ, দেখা দিয়াছে। এই ধরণের কাজ বহুকাল ধরে চলেছে এবং চলবে। বাংলা ভাষার সরকারী স্বীকৃতি এসেছে ছাত্র তথা আপামর জনসাধারণের চাপে পড়ে। স্বীকৃতিই শুধু পাওয়া গেছে কার্যকালে এর ব্যবহার কেউ করেনি। তিনি বলেন, বাংলা ভাষার শত্রু বাইরের কেউ নয়, বাংলা ভাষার শত্রু বাঙ্গালী আমলা ও পণ্ডিতরা। মুনীর চৌধুরী বলেন, শত্রু দুই ধরণের রয়েছে। এক, রাজনৈতিক বিরোধী শক্তি। দুই, সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতরা। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর মতে শিক্ষা ক্ষেত্রে ও বাংলা প্রচলনের ক্ষেত্রে বাধা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতরাই। তিনি বলেন, বাংলা ভাষা বিরোধিতার অন্যতম দুর্গ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। পণ্ডিতবর্গ বাংলা ভাষার প্রকাশ্য বিরোধিতা করে না বটে তবে টেকনিক্যাল কুযুক্তি দেখান। মুনীর চৌধুরী বলেন, বাংলার প্রচলনটাকে বিলম্বিত করার জন্যেই যত প্রকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রয়াস উদ্ভাবন করা হচ্ছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, কয়েকদিন আগে শেখ মুজিবরের ঘোষণার পরে বাংলার প্রচলনটা অনেকাংশে সহজ হয়ে আসতে পারে। তাঁর মতে, রাষ্ট্রশক্তি যদি মনে করে জনমতকে শ্রদ্ধা করতে হবে তাহ'লে প্রধান একটা সমস্যা চুকে যায়। তবে মূল সমস্যার কোন সমাধান হবে না। তিনি বলেন, এতদিন পর্যন্ত বাংলা ভাষার উন্নয়নের শুধু কথাই প্রচার করা হয়েছে। দেশে নতুন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হলে সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনে কি সুবিধা আশা করা যায়—এই প্রশ্নের উত্তরে মুনীর চৌধুরী বললেন, গণতান্ত্রিক সরকার হুকুম দিলেই কাজটা অনেকাংশে সহজ হয়ে পড়ে। হুকুম পেলে বাকীটা করা অসুবিধাজনক হবে না বলে তিনি মনে করেন।

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের আদেশ জারী হলে একাডেমিক পর্যায়ে কি করা হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, উক্ত পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা প্রচলনের উদ্যোগ হলে বাংলা বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বি. এ পাস কোর্সে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০০ নম্বর বাধ্যতামূলক করার উপর পুনর্বার জোর দেন। উল্লেখযোগ্য যে, একমাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. পাস কোর্সে ৩০০ নম্বর বাংলার বাধ্যতামূলক। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী বলেন, এই পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র বাংলা ভাষায় হতে হবে। তিনি বলেন, যদি আমরা সকল কাজের বাহন—তাহ'লে সকল অনার্স কোর্সে একশো নম্বর বাংলা বাধ্যতামূলক করা উচিত। কারণ দেখা গেছে অন্যান্য বিষয়ে খুবই ভাল রেজাল্ট করে জীবন ক্ষেত্রে আসেন যাদের অনেকেই ভাল বাংলা বলতে পর্যন্ত পারে না। জানা তো দূরের কথা বাংলাতেই যেহেতু আমাদের জীবনের সবকিছু নিয়ন্ত্রিত সেহেতু অনার্স বিষয়ের সাথে একশো নম্বর বাংলা ভাষাটা আয়ত্ত করাটা অসুবিধের কিছু নয়। বিদেশের প্রত্যেক জায়গাতেই মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান দান করা হয়। একমাত্র আমাদের দেশেই বোধ হয় নিয়ম আছে যে মাতৃভাষা চর্চা ছাড়াও বিরাট পণ্ডিত হয়ে যেতে পারে। অন্যান্য বিষয়ে যারা অনার্স পড়েন তাদের অনেকের দেখা যায় ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ের পরে বাংলা ভাষা তাদের আয়ত্বের বাইরে। এটা হওয়া উচিত নয়। সকলেরই মাতৃভাষার প্রতি অনুগত থাকা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা একশো নম্বর বাধ্যতামূলক করা প্রসঙ্গে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী বললেন, জানি বিশ্ববিদ্যালয়ে পণ্ডিত মহল এটা সহজে হতে দেবে না। এটা ইতিমধ্যেই পদে পদে আমি টের পেয়েছি। বাংলা ভাষা সকলের কম বেশী জানতে হবে এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত মহল বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, তারা এই ব্যাপারে অনবরত কুযুক্তি তোলেন। বলা হয়ে থাকে বাংলা বাধ্যতামূলক করা হলে একটা বিষয় কম পড়ে যাবে। আরো বলা হয়, বিদেশে ইংরাজী বাধ্যতামূলক নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে ইংরাজী বলার উপর মৌখিক পরীক্ষা হতো।

মুনীর চৌধুরী নির্বিশেষে বাংলাকে সকলের আয়ত্ব করতে হবে বলে দৃঢ় মত প্রকাশ করেন। প্রশ্ন করা হলো, শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা চালু হয়ে গেলে যারা বাংলায় পড়াতে অভ্যস্ত নন তাদের কি অসুবিধা হবে না? মুনীর চৌধুরী এই প্রশ্নের জবাবে বললেন, বিষয় সম্পর্কে যাঁর উপলব্ধি পরিণত হয়েছে তাঁর বাংলায় বক্তৃতা দিতে না পারার কোন কারণ নেই। তিনি মনে করেন, বিষয়কে যিনি আয়ত্ব করতে পেরেছেন তাঁর পক্ষে মাতৃভাষায় সেটা প্রকাশ করাটাইতো সবচেয়ে সহজ কাজ। তিনি বলেন, আর যারা তারপরেও পারবেন না তাদের জন্য সংক্ষিপ্ত বাংলা শিক্ষা কোর্সের ব্যবস্থা করা যাবে। শিক্ষার মাধ্যম যদি বাংলায় হয় তাহলে আমাদের যে রূপান্তরিত পাঠ্য পুস্তকের সমস্যাকে সামলাতে হবে এর পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক মুনির চৌধুরীর মত জানতে চাইলে তিনি বলেন, পাঠ্য পুস্তক বা পরিভাষা যাই বলি না কেন এর পিছনে প্রথম প্রয়োজন যদি সদিচ্ছা এবং উদ্যোগ। তিনি বলেন যদি আমাদের দেশের সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন, বাংলা ভাষায় পাঠ্য বই এর প্রয়োজন তাহলে পাঠ্য বই এতদিনে প্রচুর বেরিয়ে যেতো। আমাদের দেশে প্রকাশক আছে প্রচুর। তারা পর্যাপ্ত পাঠক পেলে বই বের করবেন না কেন? যখন বাংলা ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হয়ে যাবে তখন বাংলা ভাষায় পাঠ্য বই কেনার লোকও বেড়ে যাবে। তখন বাংলায় বইও বেরোবে প্রচুর। পাঠ্য পুস্তকটা কোন সমস্যাই নয়। সমস্যা অনুষ্ঠানে। সমস্যা হ'লো আমাদের চরিত্রের। বাংলার মাধ্যমে পড়বার এবং পড়াবার মনভঙ্গী গড়ে তুলতে হবে আমাদের সর্বাগ্রে।

মুনীর চৌধুরীর মতে, পাঠ্য-পুস্তক লেখবার জন্যে পণ্ডিত ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না। তিনি বলেন, সাধারণতঃ দেখা যায়, বড় বড় সরকারী প্রতিষ্ঠান পদাধিকার বলে পণ্ডিতদের বই রচনা করতে দেন। সেই বই আর শেষ পর্যন্ত বেরোয় না। মুনীর চৌধুরী বলেন, পাঠ্য বই রচনার জন্যে মাঝারি প্রতিভার ছাত্ররাই যথেষ্ট। পাঠ্য বই যে মানের হয়ে থাকে তা' বিশেষ মৌলিক প্রতিভার প্রয়োজন হয় না। তিনি পাঠ্য বই সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই অনুবাদ সংস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, অনুবাদ সংস্থার মাধ্যমে পাঠ্য বইয়ের ভাষান্তর অনেক সহজ ও দ্রুত হয়ে যাবে।

এক প্রশ্নের জবাবে মুনীর চৌধুরী বলেন, শুধু বাংলার ছাত্ররাই নয় প্রায় সব বিভাগের ছাত্ররাই আজ শিক্ষা জীবন শেষে চাকুরীর নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত। তবুও যারা বাংলায় এম, এ, পাস করে বেরোও তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে বাংলা বিভাগের প্রধান মুনীর চৌধুরীর মত জানতে চাইলে তিনি বলেন, বাংলা ভাষা যদি জীবনের সর্বস্তরে প্রচলিত হয়ে যায় তখন বাংলায় বহু লোকের কাজের প্রয়োজন হবে। তখন কাজের অন্ত থাকবে না। অনুবাদ বিভাগে বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরাই জায়গা করে নেবে। তিনি বলেন, এসবে পণ্ডিতের ভাষায় দরকার হয় না।

সাক্ষাৎকারের শেষ পর্যায়ে যখন উঠে আসছিলাম তখন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত বিভাগ। এই বিভাগ তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত। এখনও এই বিভাগের নয় জন শিক্ষকের অভাব রয়েছে। বাংলা ভাষা প্রসারে ও শিক্ষাদানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমি[redacted]কারও অজানা নয়। আগামী জুন মাসে বাংলা বিভাগ অর্ধ শত বার্ষিকী পালন করতে যাচ্ছে। পঞ্চাশ বছর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরও বাংলা ভাষা আন্দোলনের উনিশ বছর পরে আজ একাত্তরে শহীদ স্মরণের বেদীমূলে দাঁড়িয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুনীর চৌধুরী সখেদে যে কথা বলেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত ছাত্র-ছাত্রীরা জানতে ইচ্ছুক। অধ্যাপক বি, এ, পাস কোর্সে বাধ্যতামূলক ইংরাজী তুলে দেয়ার দাবী জানান। তিনি বাংলা সাহিত্যের ও ভাষার গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের দাবী জানান। তিনি এ দেশের ভাষা জরীপ প্রকল্প চালুর জন্য দাবী জানান।

দৈনিক পাকিস্তান ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ থেকে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কোষ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত একুশের সংকলনের তালিকা

	সম্পাদক/ প্রকাশক	
অতন্দ্র	মুশতাক ইলাহী	১৯৭০
অমর একুশে	সরদার আতীক	১৯৭১
অরুণোদয়	নজরুল ইসলাম চৌধুরী (আলোক)	১৯৭২
অ আ ই	মোঃ নূরুল ইসলাম	১৩৭৮ ব.
আমার অ আ	সৈয়দ কামরুল ইসলাম	১৯৭০
আলতা ছিটানো রং	হোসেন বেলায়েত	১৯৭০
আত্মদান	শাহজালাল উদ্দীন (বুলু)	১৯৭০
আহত পলাশ	কাজী শাহাদাত হোসেন	১৩৭৬ ব.
আত্মার বাণী	মোস্তাফিজুর রহমান (মনজু)	১৩৭৬ ব.
চই ফাগুন	নাসরীন নঈম	[তা. বি.]
আহুতি	বিজন ভট্টচার্য ও অমরজিত মিত্র	১৩৭৬ ব.
উপদ্রুত ফাল্গুন	রেজাউল হক দুলাল	১৯৭০
উদয়ের বাণী	মোঃ মনীরুজ্জামান	[তা. বি.]
ঊর্মি	মুজাফফর হোসেন	১৯৭২
উত্তপ্ত অনুভব	শ. ম. নজরুল ইসলাম	১৩৮১ ব. ১৯৭৫
এতো বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ	ভূঁইয়া ইকবাল	[১৯৭১]
একুশের ছড়া	মহিউদ্দিন শাহ আলম নিপু	১৩৮১ ব.
এবারের একুশে	আবু আলম চৌধুরী	১৯৭২
একুশ মানে মাথা নত না করা	আবুল মোমেন	১৯৮৩
ক্রান্তি	সংকলন সম্পাদনা উপ-পরিষদ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন,চট্টগ্রাম	১৯৬৮
কলকণ্ঠ একুশের সংকলন	আ.ও.ম.সানাউল্লাহ শামশুদ্দৌলা	১৩৭৬ ব.১৯৭০
কলতান	কলতান সহিত্য পরিষদ	১৯৭০
কৃষ্ণচূড়া	নুরুল্লাহ	১৯৭০
কৃষ্ণচূড়ার সংলাপ	সৈয়দ রাশীদুল হাসান	[তা. বি.]
কালো থেকে আলো	মোয়াজ্জেম হোসেন ভুঞা (মণি)	[তা. বি.]

	সম্পাদক/ প্রকাশক	
কবিতা	ময়ূখ চৌধুরী	[তা . বি.]
কিংশুক	তোফাজ্জল হোসেন	১৯৭২
কৃষ্ণচূড়া	মাহমুদ-উল আলম	১৯৭৭
চেতনার অন্য নাম	আহসান হাবিব কোহিনূর	১৯৭২
জয়ধ্বনি	খান মোহাম্মদ ফারাবী	১৯৭০
জেগে আছি	সৈয়দ মাহমুদুল হক	১৯৭০
জ্বালা মুখ	মোঃ জিয়উজ্জামান	১৩৭৬ ব.
জয় বাংলা	গোলাম মওলা	[তা.বি.]
ঝংকার	মাবজুলুল বারী	১৯৭১
ঝড়ের পাখির গান	হারুন উর রশীদ	[তা. বি.]
তিমির হননের গান	মহিউজ্জামান	১৯৭০
তোমরা যারা নিবেদিত	অতি সাম্প্রতিক আমরা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	[তা. বি]
দেশ বাংলা	নিখিল ভৌমিক	১৩৭৬ ব.
দুর্মর	লুৎফার রশীদ ও এহসান হাবিব ফিরোজ	১৯৭০
দুঃখিনী বর্ণমালা	মোমতাজ আহমেদ	[তা. বি.]
দীপ্ত একুশে	মুহম্মদ মহীউদ্দীন খান	[তা. বি.]
নির্ঝর	জয়নুল আবেদীন	১৯৬৯
নাগরিবর	সুবিনয় দাশ	১৩৭৬ ব. ১৯৭০
পদচিহ্ন	শারফউদ্দীন আহমেদ	১৯৭০
পলাশের রঙ	শেখ নূরুল ইসলাম	১৩৭৬ ব. ১৯৭০
প্রবাহ	মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ	১৩৭৬ ব.
পায়ে পায়ে	সাঈদ খান সাঈদ খান	১৩৭৬ ব.
পলাশ	মোঃ আকবর আমিন বাবুল	[তা.বি.]
পাঞ্জেরী	সাজ্জাদ হোসেন খান ও আঃ রশিদ ছিদ্দিকী	[তা. বি.]
ফেব্রুয়ারী মুখ	রাজীব আহসান চৌধুরী	
বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা	আলি নওয়াজ	১৯৬৯
বাঙময়	গোলাম সাবদার সিদ্দিকি	১৯৭০
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি	খায়রুল মতিন	১৯৭০
ব্যাহান্নোর বিনিদ্র প্রহর	উত্তরসুরী সাহিত্য গোষ্ঠি	১৯৭০
বসন্তের সুরে পুরবীর ঐকতান	রফিকুজ্জামান	১৯৭০
বিষন্ন ফাল্গুণ	মনিরুজ্জামান	১৩৭৬ ব. ১৯৭০

সম্পাদক/ প্রকাশক		
বিসর্গ	সুমন অরিন্দম	১৩৭৬ ব.
বাংলার মুখ	প্রদীপ বড়ুয়া	[তা. বি.]
বালার্ক	অনীশ বড়ুয়া	[তা. বি.]
বেতার বাংলা	ফজল - এ - খোদা	১৩৭৮ ব. ১৯৭২
ভাষার মিনার	মোঃ শফিকুল ইসলাম	১৯৭০
মশাল	মুহম্মদ আবদুল মালেক	১৯৭০
মিছিল	এস. এম. তৌফিকুল ইসলাম	১৯৭০
মৌসুমী	কাজী মাহতাব	[তা. বি.]
মৃত্যুঞ্জয়ী ফাল্গুন	হালিমা সাত্তার	১৩৭৮ ব. ১৯৭২
যে দীপ নেভেনি	আবাহনী	১৩৭৬ ব. ১৯৭০
যৌবন অনুভব	নিতাই সেন ও মোজাম্মেল হক	[তা. বি.]
রক্ত স্বাক্ষর একুশে	মোঃ ইব্রাহিম খলিল	১৯৭০
রক্ত গোলাপ	এমদাদুল হক দুলাল ও হাসানুজ্জামান মঞ্জু	১৯৭০
রক্তাক্ত বাংলা	মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন খান	১৩৭৬ ব. ১৯৭০
রক্তশপথ	রেজা আহমদ বেনজির	১৯৭০
রক্তিম স্বাক্ষর	সুশান্ত ঘোষাল	১৩৭৬ ব.
রক্ত বিন্দু	আতিকুল ইসলাম (মনির)	[তা. বি.]
রক্ত পলাশ	আবু জাফর আকরাম ও ওয়াহিদ রানা	[তা. বি.]
রক্ত সূর্য	মুকাররাম হোসেন	[তা. বি.]
রক্তাক্ত সূর্য	নরেন সরকার	[তা. বি.]
রাজপথে রাজপথে	রাজপথ শিল্পী গোষ্ঠীর সম্পাদকমণ্ডলী	১৯৭২
শোণিত সূর্য	মোঃ গিয়াস উদ্দিন ও মোঃ হারুন অর রশীদ	১৩৭৬ ব. ১৯৭০
শাশ্বত ফাগুন	জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী	১৯৭৫
সূর্য সৈনিক	সমশের আলম	১৯৭০
সূর্যরশ্মি	বিমান বিহারী দাস	১৯৭০
স্বরবর্ণ	সিরাজউদ্দিন আহমেদ	১৯৭০
স্ফুলিঙ্গ	মঈন উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী	১৯৭০
সূর্য সড়ক	শওকত হাফিজ খান (রুশ্মি)	[তা. বি.]
সূর্যাশপথ	মোঃ ছাকাতুল্লাহ (টুলু)	[তা. বি.]
স্পন্দন	মুহাম্মদ আইয়ুব	[তা. বি.]
সমস্বর	দিলওয়ার	[তা. বি.]
সূর্য উঠে	আলেয়া চৌধুরী (হিরা)	[তা. বি.]
সংশপ্তক	এ. কে. আখতার হোসেন	১৯৭০

সংকলক : মুখছুদুর রহমান

প্রতিবাদের
ভাষা